স্বাধীনতা সংগ্রামে

হাওড়া জেলার সেনানীবৃন্দ

সম্পাদনা

শ্রীপ্রফুল্ল দাশগুপ্ত

বিপ্লবী পরিষদ, হাওড়া

হাওড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামী সংগঠন

প্রকাশক :
শ্রীপুলিন বিহারী রায়
সভাপতি
বিপ্লবী পরিষদ, হাওড়া
৪৩/১, বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জী লেন,
হাওড়া-১

Life Sketches of
Freedom Fighters of
Howrah

~~পুলক প্রিন্টার্স~~
১০/২, নেপাল সাহা লেন,
হাওড়া-১

প্রাপ্তিস্থান :
বাসন্তী লাইব্রেরী
২২/১, বিধান সরণী,
কলিকাতা-৬

ব্যানার্জি বুক ষ্টল
জি, টি, রোড, হাওড়া ময়দান

Edited by : :
Sri Profulla Dasgupta
11, Hem Chakraborty
Lane, Howrah-1.

Published by :
Sri Pulin Roy
1/1, Sarat Chandra Basu
Lane, Howrah-1.

সম্পাদকের নিবেদন

"একটা জাতি যখন জাগে তখন হঠাৎ জাগে না। অন্ধকার ঘরে আলো জ্বলিলে যেমন সমস্ত ঘর আলোকিত হয়, সেইরূপ কোন যাদুমন্ত্রে হঠাৎ কোন সুপ্ত জাতির তমিস্রা রজনীর অবসান হয় না। জাতি জাগে ধীরে ধীরে, তার পিছনে থাকে বহু নীরব নিঃস্বার্থপর কর্মীর বহুদিনের সাধনা।"

ভারতের স্বাধীনতালাভ সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। ধীরে ধীরে ভারতীয় নবজাগরণের মাধ্যমে জাতির মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা সঞ্চার হয়েছিল। যার প্রথম প্রকাশ দেখি সিপাহী বদ্রোহ অথবা প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধে।

রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে বহু চিন্তানায়ক বাঙ্গালীর মনকে প্রস্তুত করার গুরুদায়ীত্ব বহন করে গেছেন। কবি, সাহিত্যিক, প্রবন্ধকার এবং নাট্যকারগণ জাতিকে ক্রমশ সংগ্রাম-মুখীন করে তুলেছেন।

নিয়মতান্ত্রিক পথে আবেদন নিবেদন সম্বল করে যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিল শেষ পর্যন্ত তাই পরিণত হল সংগ্রামী কংগ্রেসরূপে। তারও পূর্বে উপযুক্তরূপে সংগঠিত না হয়েই ভারতের নানা স্থানে বহু কৃষক বিদ্রোহ, সাঁওতাল আদিবাসী বিদ্রোহ কিম্বা দেশীয় ক্ষুদ্র রাজ্যের নৃপতি ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বিফল হয়েছেন। কিন্তু এই সব সংগ্রাম জাতির চেতনাকে নাড়া দিয়ে গেছে।

বিংশ শতাব্দীর সূচনায় সুসংগঠিতরূপ নিল বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন। সরকারী ভাষায় যার নাম ছিল সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ্য করে, স্বদেশী যুগ, তারই ফলশ্রুতি বিপ্লব যুগ। আবার বিপ্লব যুগই ডেকে আনলো কংগ্রেসের

মধ্যে সংগ্রামী চেতনা। তারই ফলে অসহযোগ আন্দোলন। পরের ধাপ হল আইন অমান্য আন্দোলন। কংগ্রেস এবং সকল দলের সহযোগীতায় সংঘটিত হল আগষ্ট বিপ্লব। তার পাশাপাশি নেতাজীর আজাদ হিন্দ বাহিনীর দিল্লী অভিযান এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজ বন্দরের নৌবিদ্রোহ ইংরাজকে শেষ আঘাত করে ভারত ছাড়তে বাধ্য করল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীন হল। স্বাধীনতা আন্দোলনের এই বিবর্তনে একটা জিনিষ বিশেষ লক্ষনীয়। প্রত্যেকটি ধাপে স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিচালকগণ সেই যুগ উপযোগী রাজনৈতিক লক্ষ্যের কথা চিন্তা করেছেন, পরবর্তী যুগে আবার চিন্তাধারার পরিবর্তন হয়েছে। স্বায়ত্বশাসন থেকে স্বরাজ এবং পূর্ণ স্বাধীনতার পর চিন্তাধারা প্রবাহিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে।

বাংলার প্রধান বিপ্লবীদল অনুশীলন সমিতির আদর্শ এবং উদ্দেশ্য দলের নামের মধ্যেই নিহিত ছিল। অনুশীলন পরিকল্পিত সমাজে প্রত্যেক নরনারীর মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের পরিকল্পনা ছিল। সকলপ্রকার বৈষম্য দূর করে সকল মানুষের মধ্যে সমতা আনয়নই ছিল লক্ষ্য। পরাধীন অবস্থায় এই লক্ষ্যে সমাজকে চালিত করা সম্ভবপর নয় বলেই বিপ্লবীরা পরাধীনতার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। যুগান্তর এবং অন্যান্য বিপ্লবীদলও দেশের মধ্যে একটা যুগান্তরের সূচনাই করেছিলেন।

স্বাধীনতার রজতজয়ন্তীর অবকাশে বিপ্লব আন্দোলনে যাঁরা শহীদ হয়েছেন এবং নানা নির্যাতন ভোগ করে আজও যাঁরা আমাদের মধ্যে জীবিত আছেন তাঁদের জন্য সমগ্র জাতির গর্ব করা স্বাভাবিক। পরলোকগত নেতা ও কর্মীদের প্রতি জাতির কৃতজ্ঞতা স্বীকার এবং শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদনের এই সুযোগ আমরা গ্রহণ করি।

বর্তমানকালে পরিপূর্ণ শিক্ষালাভ এবং স্বদেশ ও বিদেশের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে রাজনৈতিক আন্দোলনে কাজ করা সম্ভব। কিন্তু বিপ্লব যুগে অধিকাংশ কর্মীই ছিলেন তরুণ বয়স্ক। স্কুল

কলেজের পাঠ শেষ করা পূর্বেই বিপ্লবের আহ্বানে ঘর ছেড়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বিপ্লবী জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁদের কেটেছে আত্মগোপন করে অথবা ইংরাজ কারাগারে। কিন্তু যে অদম্য প্রেরণা তাঁদের ঘরছাড়া করেছিল তাই তাঁদের গড়ে তুলেছিল অতুলনীয় কর্মীরূপে। সেদিন কেউ ফুলের মালা নিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করে নি। অর্থশালী ইংরাজ ভক্ত মানুষ এবং নিরক্ষর ভীত সাধারণ মানুষের অধিকাংশই তখন বিপ্লবীদের কোন সহায়তা দেয় নি। কিন্তু সেদিন দেশের কয়েকজন কবি এবং সাহিত্যিক উদ্দীপনাময়ী রচনাবলী দিয়ে স্বাধীনতা পাগল বিপ্লবীদের সমগ্র চেতনাকে উদ্দীপ্ত করেছিলেন। দেশ বিদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, যুদ্ধের ইতিহাস, অস্ত্র ও বোমা তৈরী এবং ব্যবহার করা সম্পর্কীয় পুস্তক সমূহ বিপ্লবীদের অবশ্য পাঠ্য ছিল। একমাত্র গীতাপাঠের মাধ্যমেই বিপ্লবীরা আধ্যাত্মিক চেতনা এবং আচার আচরণ সম্পর্কে যে শিক্ষালাভ করেছিলেন তা কোন বিশ্ববিদ্যালয় সর্বোচ্চ পরীক্ষার মাধ্যমেও শেখাতে পারে না। বিপ্লবীরা সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে একদিকে দেশবাসীর মনে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করেছেন এবং অন্যদিকে ইংরাজ সরকারকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে একতরফা অত্যাচারের দিন শেষ হয়ে আসছে। অন্ধকার যুগে বিপ্লবীরা নবজাগরণ এনেছিলেন। বিপ্লবীরা ছিলেন নীরব নিস্কাম কর্মী। নাম যশের প্রত্যাশা তাঁরা করেন নি। নেতৃত্বের লোভ করেন নি। চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রেখে বিনা প্রতিবাদে নেতার আদেশ প্রতিপালন করতে গিয়ে হাসি-মুখে জীবন বিসর্জন দিয়ে গেছেন দেশমাতৃকার চরণতলে।

বিপ্লবের পরে স্বাধীনতা আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন এবং কৃষক আন্দোলনেও বহু নীরব নিঃস্বার্থ কর্মী জীবন দান করে গেছেন নীরবে। অনেক সময় এই সব আত্মদানের কথা কেউ জানতে পর্যন্ত পারে নি।

যে উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য নিয়ে বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীগণ জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এবং নির্যাতন ভোগ করে আজও বেঁচে

আছেন তাঁরা জীবন সায়াহ্নে উপনীত হয়ে দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন যে আজও তাঁদের লক্ষ্য পূর্ণ হয় নি। কৈশোর এবং যৌবনের স্বপ্ন এখনও বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনসহ সকলপ্রকার সামাজিক বৈষম্যের অবসান ঘটাতে না পারলে ভারতের অগনিত জনতাকে শোষণমুক্ত সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না।

সংগ্রাম আজও শেষ হয় নি। সংগ্রাম আজ শোষণের বিরুদ্ধে, অসাম্যের বিরুদ্ধে। আজও যারা সংগ্রামের সৈনিক, বিপ্লবী পরিষদ তাদের সংগ্রামী অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে এবং তাদের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছে।

হাওড়া জেলায় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি ধাপেই কর্মীরা এগিয়ে গেছেন। হাওড়ার তরুণদের মধ্যে বর্তমানকাল পর্যন্ত যে অদম্য একটা একাত্মতা লক্ষ্য করা যায় তা পূর্বসূরীদের সাধনারই ফল। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পূর্ব থেকে নেতাজী প্রবর্তিত আন্দোলন, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, শ্রমিক-কৃষক এবং কম্যুনিষ্ট আন্দোলন ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার আন্দোলনেই হাওড়া যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করেছে।

বিপ্লবী পরিষদের আহবানে যে সকল নির্যাতীত স্বাধীনতা সংগ্রামী নিজ নিজ পরিচিতি পাঠিয়েছেন এবং পরলোকগত নেতা ও কর্মীদের আত্মীয় স্বজনরা যে সকল বিবরণ পাঠিয়েছেন তা অবলম্বন করেই হাওড়ার স্বাধনীতা সংগ্রামীদের আলোকচিত্র সহ পরিচিতি প্রকাশের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। অল্প সময়ের মধ্যে সীমিত সামর্থের দ্বারা পুস্তক প্রকাশের প্রচেষ্টায় অনেকের পরিচিতি সংক্ষেপ করে নিতে হয়েছে। দুতিন জনের সহযোগিতায় সম্পা-দককে এই দুরুহ কাজ খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্পাদন করতে হওয়ায় কিছু ভুল ক্রুটী থাকা স্বাভাবিক। পাঠক সাধারণ এবং যাদের পরিচিতি প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করি। পরবর্তী সংস্করণে বিপ্লবী পরিষদ আরও অনেকের সঙ্গে

যোগাযোগ করে হাওড়া জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি প্রকাশে সচেষ্ট হবে।

শ্রীপুলিন রায়, শ্রীবলাই চন্দ্র সিংহ এবং শ্রীকানাই ব্যানার্জী নিরলস পরিশ্রম করে বিপ্লবী পরিষদের সূচনা করেন। ক্রমে ক্রমে শ্রীবিভূতি ভূষণ ঘোষ (নান্টু) এবং শ্রীবীরেন ব্যানার্জী সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। তারপর বহু প্রবীন নেতা ও কর্মী শুভ কামনা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছ থেকে পাওয়া বিবরণ পরীক্ষা করে দেখেছেন শ্রীচণ্ডীদাস ঘোষ, শ্রীদুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিভূতি ঘোষ (নান্টু), শ্রীবীরেন ব্যানার্জী, প্রমুখ ব্যক্তিগণ। সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী পেন্সনের জন্য দরখাস্ত এবং এফিডেভিট করতে আবেদনকারীগণকে যথাসাধ্য সহায়তা দান করা হয়েছে। পরিচিতির প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর দ্বিতীয় বর্দ্ধিত সংস্করণের কাজে হাত দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ গড়ে তুলে বিপদে আপদে প্রত্যেকে যাতে অন্যের পাশে দাঁড়াতে পারেন সে প্রচেষ্টাও চলছে।

পরিচিতি পুস্তক সম্পাদনা এবং প্রকাশের দায়ীত্ব আমার উপর ন্যস্ত করে বিপ্লবী পরিষদ আমাকে সম্মানিত করেছেন। সমসাময়িককালের সংগ্রামী বন্ধু এবং নেতাদের (জীবিত এবং মৃত) এই সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রকাশে আমার অক্ষমতা স্বত্বেও শ্রদ্ধানম্রচিত্তে দায়ীত্ব গ্রহণ করেছি। কয়েকটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লেখায় শ্রীবামাপদ দাস মহাশয়ের সাহায্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

বিপ্লবী পরিষদের সভাপতি অক্লান্তকর্মী শ্রীপুলিন রায় আজীবন বিপ্লবী। দুঃসাহসিক এই প্রচেষ্টায় তিনি বয়সের গুরুভার বিস্মৃত হয়েই কাজ করেছেন। সঙ্গে আরও একজন বর্ষীয়ান বিপ্লবী শ্রীবলাই সিংহও পুস্তক প্রকাশনায় প্রচুর পরিশ্রম করেছেন।

অবিশ্রান্ত দ্রুতগতিতে ছাপার কাজ করে পুলক প্রিন্টার্সের শ্রীমদন কোলে স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী দিবসে এই পুস্তকের প্রকাশ সম্ভব করেছেন।

হাওড়া জেলার অধিবাসী বিশেষ করে তরুণ সম্প্রদায় এবং ভবিষ্যৎকালের নাগরিকদের কাছে বিস্মৃত ইতিহাসের সামান্য অংশ তুলে ধরার সুযোগ পেয়ে বিপ্লবী পরিষদ ধন্য। অতীতের আলোকেই বর্তমানের শিখা জ্বালতে হয় এবং বর্তমানই আবার সৃষ্টি করে ভবিষ্যৎ। বিবর্তনের এই হল চিরাচরিত নিয়ম।

স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী

১৯৭২

১১, হেম চক্রবর্তি লেন, হাওড়া-১

শ্রীপ্রফুল্ল দাশগুপ্ত

সম্পাদক।

সংগ্রামের আহ্বান
আজও যাদের দোলা দেয়

॥ সূচীপত্র ॥

যাঁরা আজ আমাদের মধ্যে নেই

বন্দে মাতরম্

বন্দে মাতরম্

সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাম্

শস্য-শ্যামলাং মাতরম্।

শুভ্র জোৎস্না-পুলকিত যামিনীম্,

ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম্,

সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিনীম্

সুখদাং বরদাং মাতরম্।

সপ্ত-কোটী কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে,

দ্বিসপ্ত কোটী ভূজৈধৃত খরকর বালে,

অবলা কেন মা এত বলে।

বহুবল ধারিনীং নমামি তারিণীং

রিপুদল বারিণীং মাতরম্।

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম,

তুমি হৃদি, তুমি মর্ম,

ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।

বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারি প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিণী,
কমলা কমল দল বিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাম।

নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরম্।
বন্দেমাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরম্।
বন্দে মাতরম্।

বঙ্কিম চন্দ্র

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ
"এনে ছিলে সাথে করে
মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি
করে গেলে দান।"

সকল দেশের সেরা

ধন ধান্য পুষ্পভরা আমাদেরই এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা,
ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা;

(কোরাস্) এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক' তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ, এমন কাল মেঘে।
তা'রা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।
তা'রা পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠে পাখীর ডাকে জেগে।

(কোরাস্) এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।
এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়।
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে।
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।

(কোরাস্) এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবেনাক' তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।
পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে,
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।

(কোরাস) এমন দেশটি কেথাও খুঁজে পাবেনাক' তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।
ভায়ের মায়ের এতস্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ।
ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি।

(কোরাস) এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

দ্বিজেন্দ্র লাল রায়

বাংলার মাটি

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান।

বাংলার ঘর, বাংলার হাট,
বাংলার বন, বাংলার মাঠ,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক
পুণ্য হউক, হে ভগবান।

বাঙালির পণ, বাঙালির আশা,
বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক, হে ভগবান।

বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন,
বাঙালির ঘরে, যত ভাই বোন.
এক হউক, এক হউক,
এক হউক, হে ভগবান।

রবীন্দ্র নাথ

সোনার বাংলা

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

ও মা, ফাল্গুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে, (মরি হায় হায় রে)

ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি
কী দেখেছি মধুর হাসি।

কী শোভা, কী ছায়া গো,
কী স্নেহ, কি মায়া গো,
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে,
নদীর কূলে কূলে।

মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে
লাগে সুধার মতো (মরি হায় হায় রে)

মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা,
আমি নয়ন জলে ভাসি।

রবীন্দ্র নাথ

একবার বিদায় দে মা

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি,
হাসি হাসি পোরব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী
একবার বিদায় দে মা············।

কলের বোমা তৈরী করে,
দাঁড়িয়ে ছিলাম রাস্তার ধারে, মা গো,
বড় লাট্‌কে মারতে গিয়ে মা,
মারলাম ভারতবাসী।
একবার বিদায় দে মা············।

হাতে যদি থাকতো ছোরা,
তোর ক্ষুদিকি পড়তো ধরা, মা গো,
তখন রক্ত মাংস এক করিতাম,
দেখত ইংলণ্ডবাসী,
একবার বিদায় দে মা···

শনিবার বেলা দশটার পরে,
জজ্ কোর্টেতে লোক না ধরে, মা গো,
হল অভিরামের দিপচালন মা,
ক্ষুদিরামের ফাঁসি,
একবার বিদায় দে মা······

বারো লক্ষ তেত্রিশ কোটি,
রইল মা তোর বেটা-বেটি, মা গো,
তাদের নিয়ে ঘর করিস মা,
বউদের করিস দাসী,
একবার বিদায় দে মা············।

দশ মাস দশ দিন পরে,
জন্ম নেব মাসির ঘরে, মা গো,
তখন যদি না চিনতে পারিস মা,
দেখবি গলার ফাঁসি,
একবার বিদায় দে মা············।

ক্ষুদিরাম

শিকল পরার গান

এই শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল পরা ছল।
এই শিকল প'রেই শিকল তোদের করব রে বিকল॥

তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হ'তে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন ভয়।
এই বাঁধন প'রেই বাঁধন ভয়কে করব মোরা জয়
এই শিকল বাঁধা পা নয় এ-শিকল ভাঙা কল॥

তোমার বন্ধ ঘরের বন্ধনীতে করছ বিশ্ব গ্রাস
আর ত্রাস দেখিয়েই করবে ভাবছ বিধির শক্তি হ্রাস
সেই ভয় দেখান ভূতের মোরা করব সর্ব্বনাশ,
এবার আনব মাভৈঃ বিজয় মন্ত্র বল হীনের বল॥

তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়,
সেই ভয়ের টুঁটিই ধরব টিপে করব তারে লয়,
মোরা আপনি মরে মরার দেশে আনব বরাভয়,
মোরা ফাঁসি পরে আনব হাসি মৃত্যু জয়ের ফল॥
ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল ঝঞ্ঝনা
এযে মুক্তি পথের অগ্রদূতের চরণ বন্দনা।
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা,
মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল॥

নজরুল

ভাঙার গান

কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙ্গে ফেল, কররে লোপাট
রক্ত জমাট
শিকল পূজার পাষাণ বেদী।

ওরে ও তরুণ ঈশান।
বাজা তোর প্রবল বিষাণ।
স   নিশান
উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদি'।

গাজনের বাজনা বাজা।
কে মালিক? কে সে রাজা?
কে দেয় সাজা

মুক্ত স্বাধীন সত্য কে রে?
হা-হা-হা পায় যে হাসি,
ভগবান পরবে ফাঁসি
সর্ব্বনাশী
শোনায় এ হীন তথ্য কেরে?

ওরে ও পাগলা ভোলা
দে রে দে প্রলয় দোলা
গারদগুলা
জোরসে ধরে হেঁচকা টানে !

মার হাঁক হৈদরী হাঁক,
কাঁধে নে দুন্দুভি ঢাক,
ডাক্ ওরে ডাক্
মৃত্যুকে ডাক্ জীবন পানে।

নাচে ঐ কাল বৈশাখী
কাটাবি কাল ব'সে কি ?
দে রে দেখি
ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি,

লাথি মার, ভাঙরে তালা !
যত সব বন্দী শালায়—
আগুন জ্বালা,
আগুন জ্বালা, ফেল_উপাড়ি।

নজরুল

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
তবে একলা চলোরে।"

স্বাধীনতা সংগ্রামীর ডাণ্ডি অভিযান।

তুমি আমায় রক্ত দাও
আমি তোমায় স্বাধীনতা দেব।

নেতাজী

কদম কদম বঢ়ায়ে জা,
খুশীসে গীত গায়ে জা।
য়হ জিন্দগী হৈ কৌমকী,
তো কৌম পর লুটায়ে জা।

তু শেরে হিন্দী আগে বঢ়,
মরণেসে ফির ভি তু ন ডর।
আশমান তক্ উঠাকে শর,
জোসে বতন বঢ়ায়ে জা।

তেরী হিমত বঢ়তী রহে,
খুদা তেরী শুনতা রহে!
তজা সামনে তেবে চরে,
তো খাঁকসে মিলায়ে জা॥

আজাদ হিন্দ।
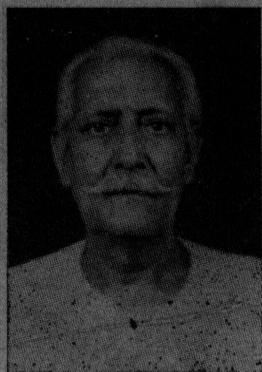
শ্রীবলাই চন্দ্র সিংহ (২)

শ্রীপুলিন বিহারী রায় (৩)
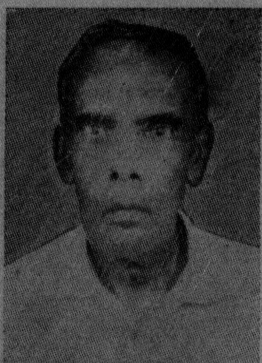
শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য (৪)
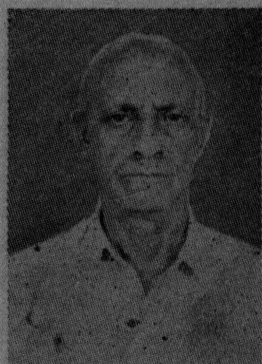
শ্রীবীরেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (
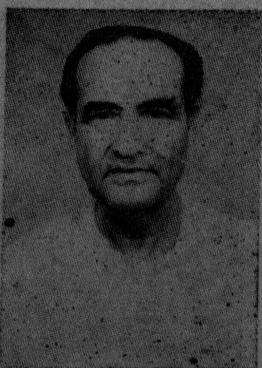
শ্রীশিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৭)
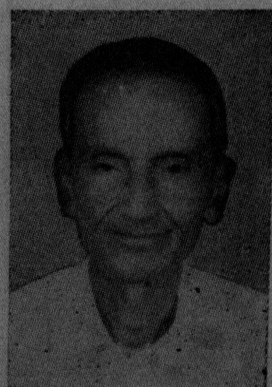
শ্রীবিভূতি ভূষণ ঘোষ (৮)
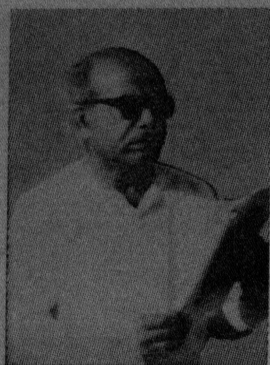
শ্রীচণ্ডীদাস ঘোষ (১৭)
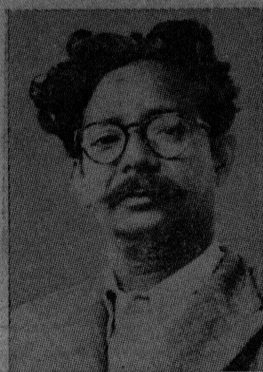
শ্রীবিভূতি ভূষণ ঘোষ (নান্টু) (১৮)
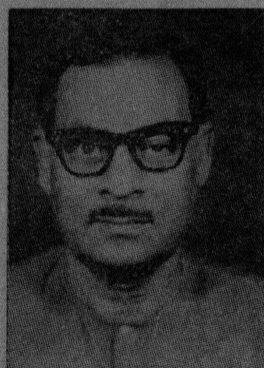
শ্রীপ্রফুল্ল দশগুপ্ত (১৯)
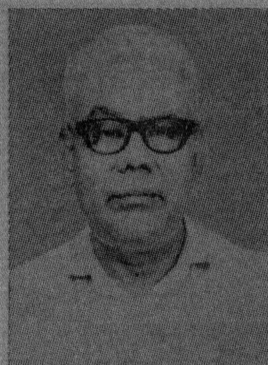
শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (২০)
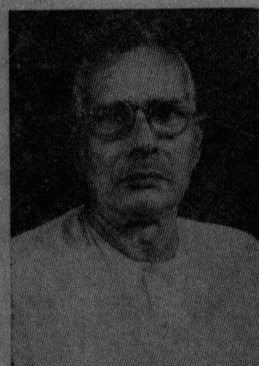
শ্রীবিভূতি ভূষণ আদিত্য (২১)
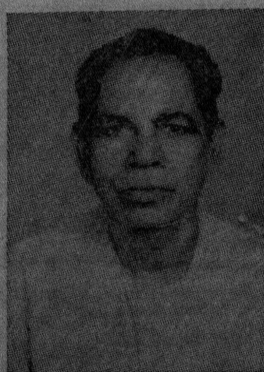
শ্রীকমলাকান্ত শ্রীমানী ২২)

শ্রীসুধীর কুমার রায় (২৩)
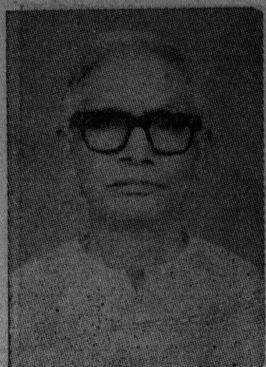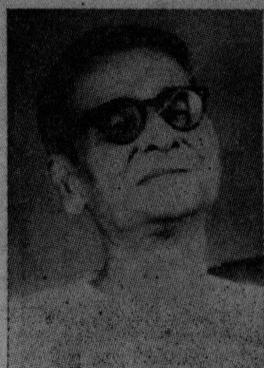
শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (২৫)

শ্রীবিষ্ণুপদ খাঁড়া (২৭)
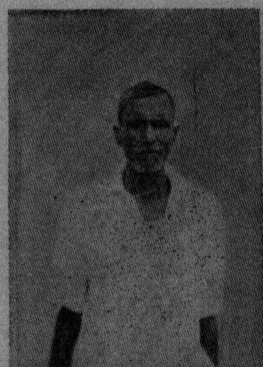
শ্রীধরণীধর মাইতি (২৮)
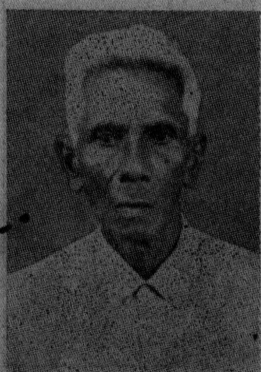
শ্রীসত্যচরণ গিরি (২৯)
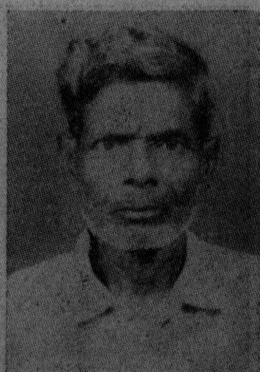
শ্রীশরৎ চন্দ্র ওঝা (৩১)
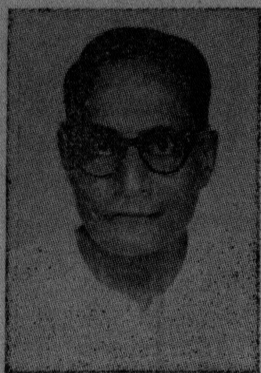
শ্রীনন্দলাল সরকার (৩২)
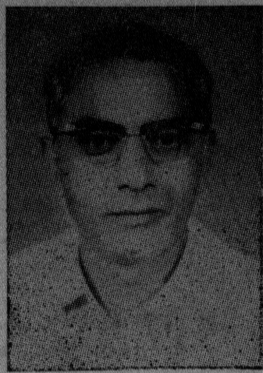
শ্রীঅনঙ্গ মোহন পাণ্ডা (৩৩)
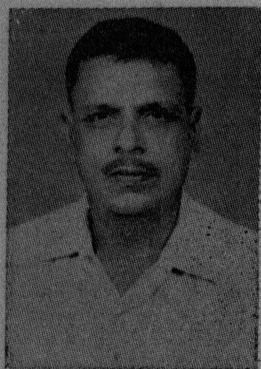
শ্রীচুণীলাল দত্ত (৩৮)
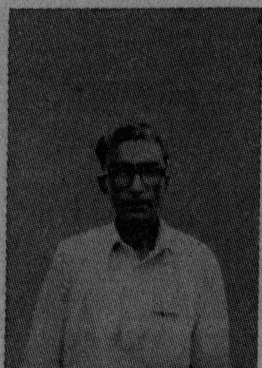
শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী (৩৯)

শ্রীকানাইলাল সামন্ত (৪১)
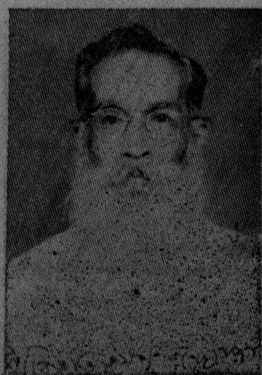
শ্রীবিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (৪৪)
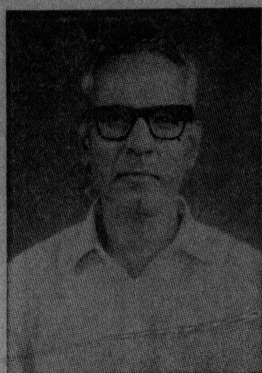
শ্রীনয়নরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (৪৫)

শ্রীসুফল চন্দ্র মান্না (৪৬)
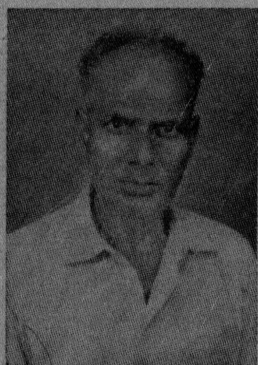
শ্রীতারাপদ মজুমদার (৪৭)

শ্রীনবনী কুমার চক্রবর্ত্তী (৪৯)
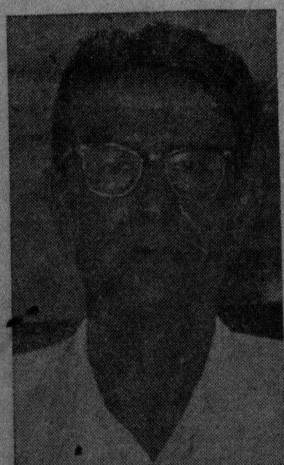
শ্রীহেমন্ত কুমার দে (৫০)
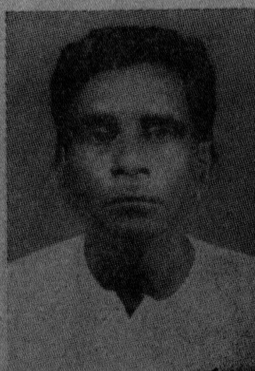
শ্রীবনমালী ঘোষ (৫১)
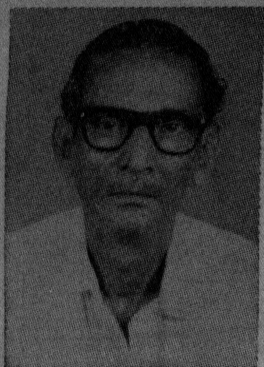
শ্রীমুরারী মোহন মণ্ডল (৫৩)

শ্রীসুশীল কুমার ব্যানার্জী (৫৪)

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকমল সরকার (৫৫)
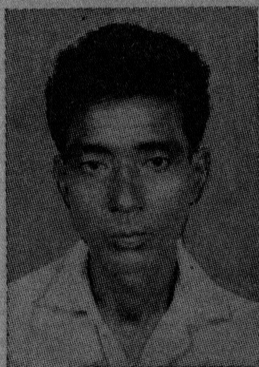
শ্রীবিষ্ণুপদ ধাড়া (৫৬)
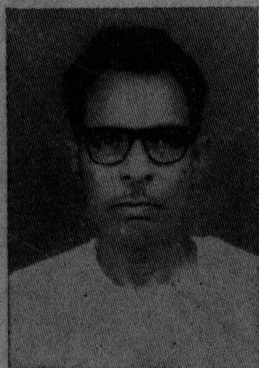
শ্রীগোষ্টবিহারী বসু (৫৭)
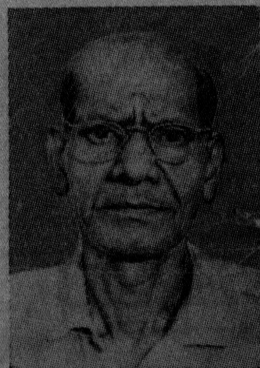
শ্রীপরেশ চন্দ্র পাত্র (৬০)
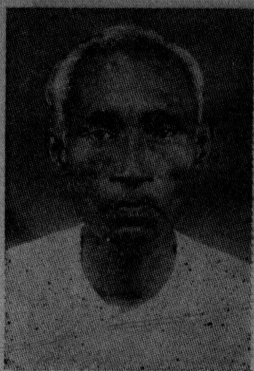
শ্রীফণীন্দ্রনাথ মাজী (৬১)
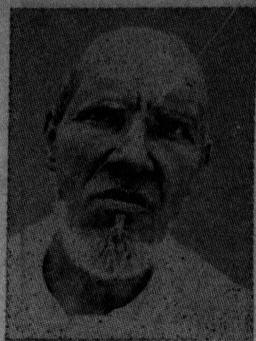
সেখ আব্দুল মুজিদ (৬২)
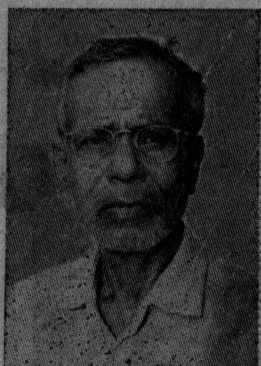
শ্রীজীতেন্দ্র নাথ পাত্র (৬৩)

শ্রীমহাদেব পাত্র (৬৫)
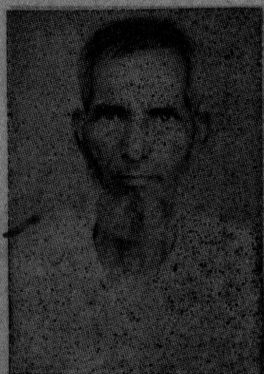
ফোরকান আলী খাঁ (৬৭)
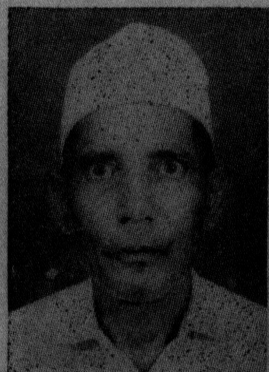
শ্রীবিভূতি ভূষণ ব্যানার্জী (৬৮)
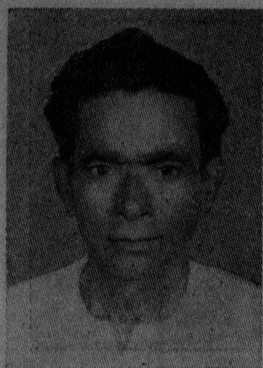
শ্রীনরেন্দ্রনাথ খাঁড়া (৬৯)

শ্রীউমাকান্ত বেরা (৭০)
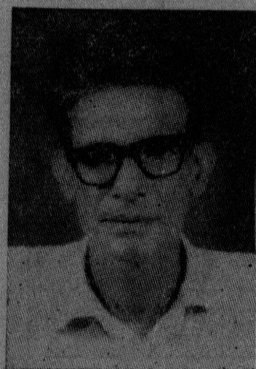
শ্রীজীতেন্দ্র নাথ দত্ত (৭১)

শ্রীসুধীর চন্দ্র মাজী (৭২)
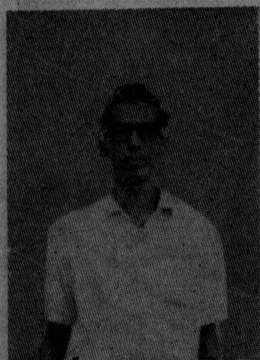
শ্রীঅবধূত মান্না (৭৩)
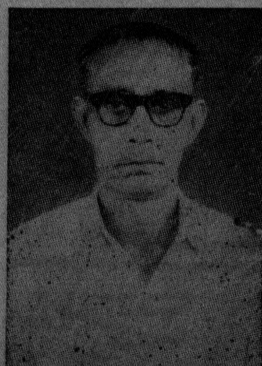
শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় (৭৪)
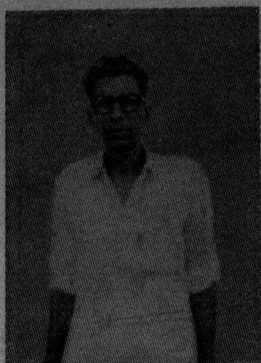
শ্রীপ্রবোধ কুমার দাস (৭৫)
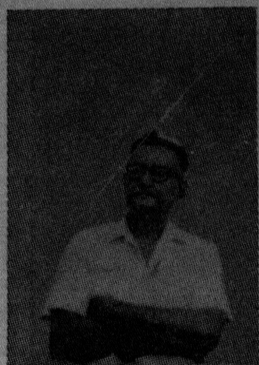
শ্রীবিমল কৃষ্ণ পাল (৭৬)
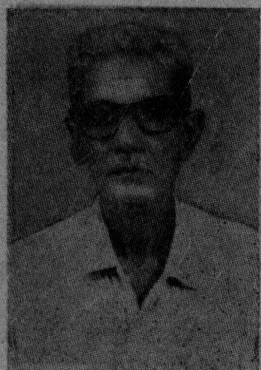
শ্রীলক্ষ্মণ চন্দ্র ধাড়া (৭৭)
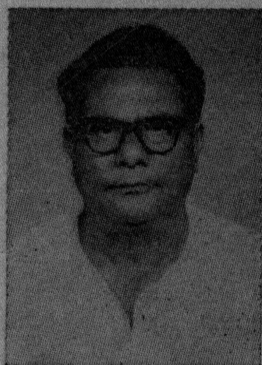
শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র ঘোষ (৭৮)
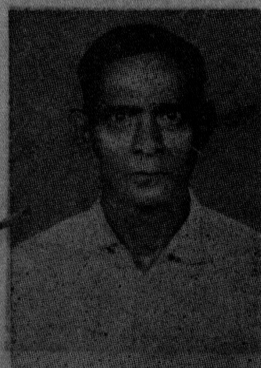
শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বসু (৮০)
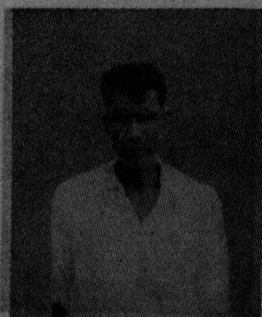
শ্রীদাম চন্দ্র ভৌমিক (৮২)
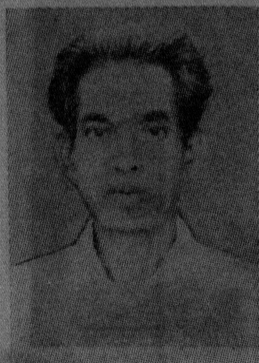
শ্রীজিতেন্দ্র নাথ সামন্ত (৮৩)
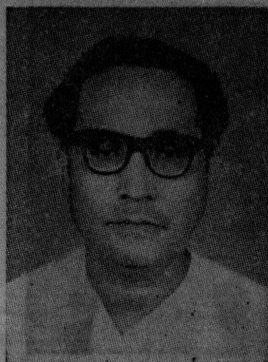
অধ্যক্ষ শ্রীশান্তি কুমার দাশগুপ্ত (৮৫)

শ্রীসুনীল ঘোষাল (৮৬)
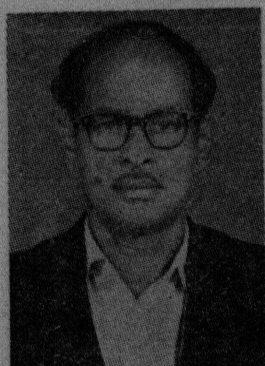
শ্রীঅনাথ কুমার মণ্ডল (৮৭)
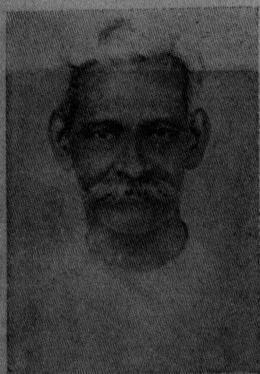
শ্রীমুরারী মোহন দে (৮৮)
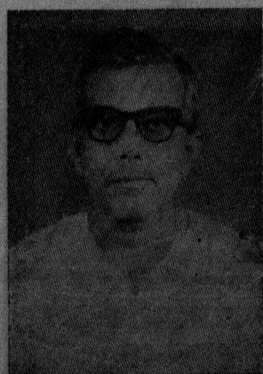
শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত (৮৯)

শ্রীহরিদাস মিত্র (৯০)
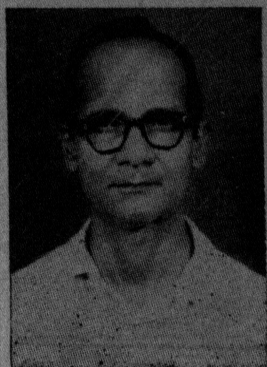
শ্রীযুগোল কিশোর নিয়োগী (৯১)

শ্রীরামচন্দ্র হাজরা (৯২)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৯৩)

শ্রীগোষ্ট বিহারী মাইতি (৯৪)
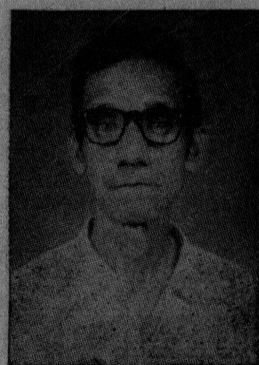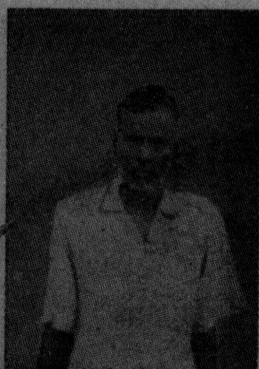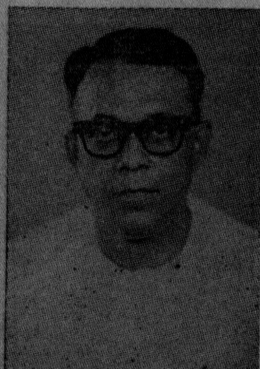
শ্রীমণিমোহন সরকার (৯৫)
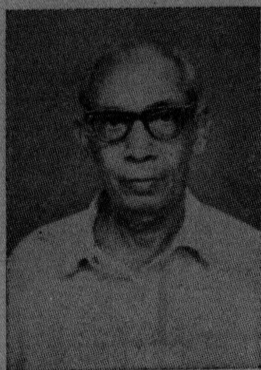
শ্রীবিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (৯৬)
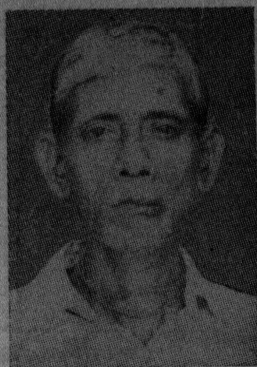
শ্রীবাবুরাম খাঁ (৯৭)
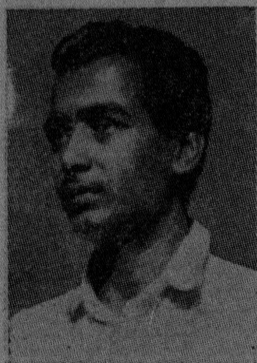
শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র বসু (৯৮)
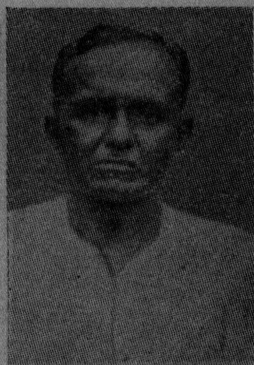
শ্রীঅজিত কুমার ঘোষ (১০০)
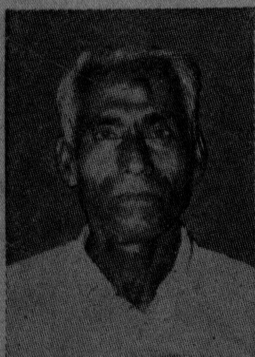
শ্রীঅনীষ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১০১)
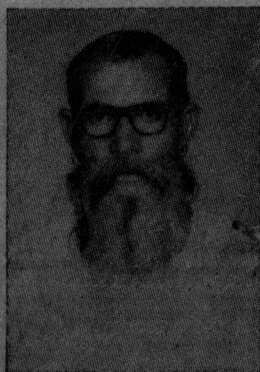
শ্রীবিভূতি ভূষণ মুখার্জি (১০২)
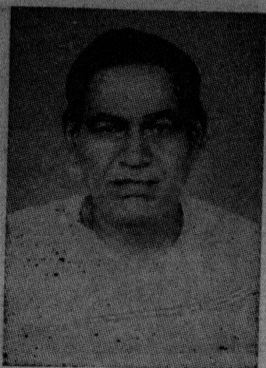
শ্রীসুধাংশু শেখর মুখোপাধ্যায় (১০৩)
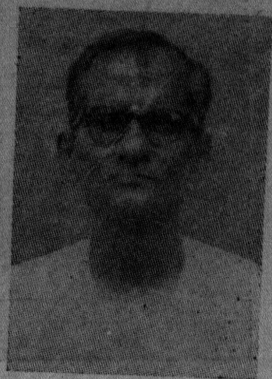
শ্রীদিবাকর খাঁ (১০৪)
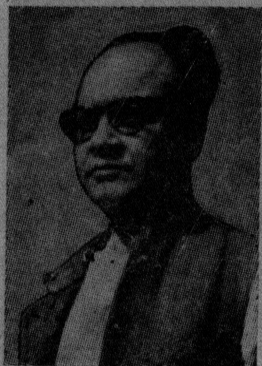
শ্রীহরিপদ মজুমদার (১০৫)
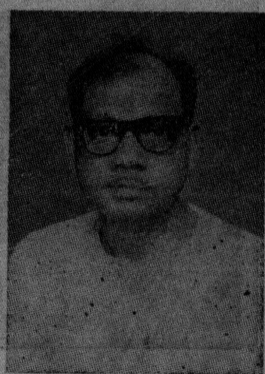
শ্রীপ্রফুল্ল কুমার সরকার (১০৬)
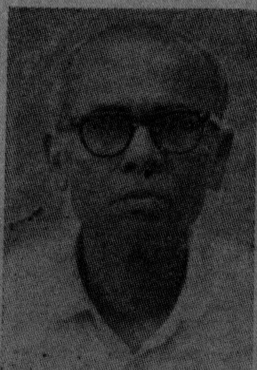
শ্রীনির্মল চন্দ্র দাস (১০৭)
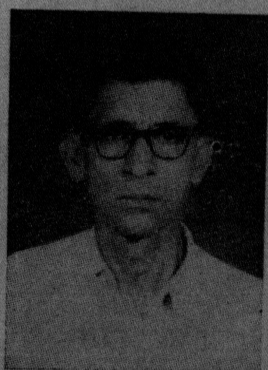
শ্রীসতীশ চন্দ্র সামন্ত (১০৮)
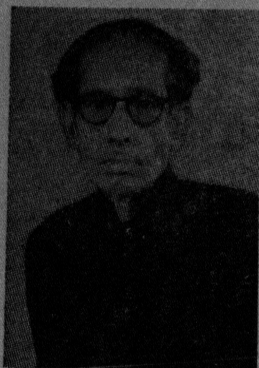
শ্রীইন্দুভূষণ ব্যানার্জি (১১১)
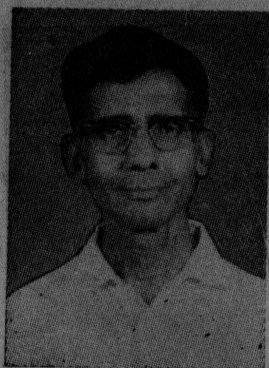
শ্রীনন্দকুমার মুখোপাধ্যায় (১১২)
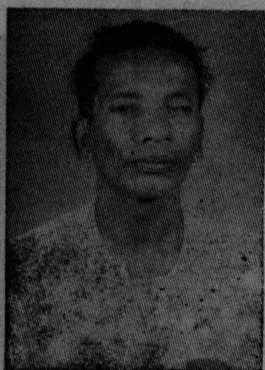
শ্রীকার্তিক চন্দ্র সেনাপতি (১১৩)
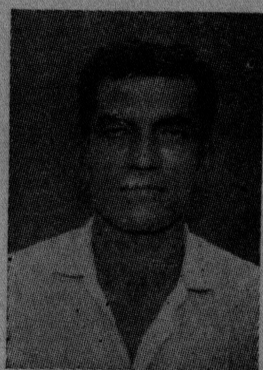
শ্রীনিমাই দাস (১১৪)
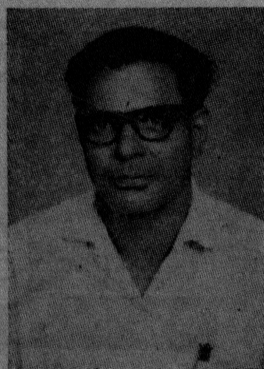
শ্রীশচীন্দ্র নাথ দে (১১৫)

শ্রীমদন মোহন ঢ্যাং (১১৮)

শ্রীবিজন বন্দোপাধ্যায় (১)

বিপ্লবী বীর রাসবিহারী বসুর সারা ভারত ব্যাপী বিপ্লবী চিন্তার-ঢেউ যখন সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতিটি ক্ষেত্রে জোয়ার তুলিয়াছে, ঠিক সেই সময়ে হাওড়া জেলার বালী থানার ৺হেরম্ব চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীবিজন বন্দোপাধ্যায় (৭৫) ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন। অন্যান্য বিপ্লবীদিগের ন্যায়, তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ ভারতমাতাকে মুক্ত করিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। ইংরাজ সরকার তাঁহার কার্য্যাবলী কে সন্তুষ্ট চিত্তে হজম করিতে না পারিয়া ১৯৩৬ সালে (২।৯।১৬) তাঁহাকে গ্রেফতার করেন। দীর্ঘ দুইবৎসর অন্তরীণ থাকিবার পর ১৯১৮ সালে তিনি মুক্ত হন। মুক্ত হইবার পর একটি মূহর্ত্তও বিশ্রাম না করিয়া দেশমাতৃকার সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইংরাজ সরকার তাঁহার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করিলে তিনি ১৯২৪ সাল হইতে আত্মগোপন করিবার পর ১৯২৭ সালে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন। ৩ বছর কারা জীবন যাপন করিবার পর পুনরায় তিনি দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দী হইয়া ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩২ সালে মুক্ত হইবার পরই তাঁহাকে স্বগৃহে অন্তরীণ করা হয়। ১৯৩৫ সালে মুক্ত হন। এই সময় হইতে তিনি মার্কসবাদে বিশ্বাসী হন। আজও তিনি এই নীতির প্রতি অটল বিশ্বাস রাখিয়াছেন। জেলে বন্দী জীবনযাপনকালীন তিনি অকথ্য শারিরীক নির্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজনৈতিক জীবনে তিনি যাঁহাদের সাহচর্যে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীবীরেন ব্যানার্জ্জি, সন্তোষ গাঙ্গুলী, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংগ্রামী জীবনে ৬ বৎসর কারাবাস, ৫ বৎসর অন্তরীণ থাকা ছাড়াও ৩ বৎসর আত্মগোপন করিতে হয়।

শ্রীবলাই চন্দ্র সিংহ (১)

বর্তমান শতকের প্রথম পাঁচ বছর বাংলার বিপ্লবী আন্দো-লনের প্রথম প্রস্তুতিকাল। এই সময়ের মধ্যে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা বোধহয় মাতৃগর্ভে থেকেই বিপ্লবের ডাক শুনে-ছিলেন। ১৯০০ সালে হাওড়া জেলার প্রান্তসীমায় নতিবপুর (হুগলী) গ্রামে সিংহ পরিবারে ৺মহেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের পুত্র বলাই চন্দ্রের জন্ম।

শৈশব এবং বাল্যকালেই বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী আন্দোলন ইত্যাদির আভাস পেয়েই বলাই চন্দ্র কৈশোরে উপনীত হন। লেখাপড়ার জন্য এলেন রাজধানী কলকাতায়। বহুবাজার অঞ্চলে বসবাস করার সময় বিপ্লবী নায়ক বিপিন গাঙ্গুলীর প্রভাব অতি স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে আকর্ষণ করে। বিপিনদার নির্দ্দেশেই যোগ দিলেন মধ্য কলিকাতা কংগ্রেসে। গোপন কার্যকলাপেও যথাসময়ে দীক্ষালাভ হল।

১৯২১ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে বড়বাজারে বিলাতি বস্ত্র বর্জন আন্দোলনের পিকেটিং-এ যোগ দিলেন। সংগী ছিলেন দেশবন্ধু পুত্র চিররঞ্জন, সুন্দর সিং এবং উর্মিলা দেবী প্রভৃতি। থানা হাজতে বাসন্তী দেবীর সংগে সাক্ষাৎ। বিচারে ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

একবার কারাবাসের পরই স্বদেশী মার্কা পড়ে গেল। আরও উৎসাহ নিয়ে নায়ক বিপিনদার নির্দ্দেশে বৃহত্তর আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ১৯২৩ সালে বিপ্লবীদের হাতে শাঁখারী-টোলার পোষ্ট মাষ্টার খতম হল। গ্রেপ্তারী পরওয়ানা এড়িয়ে বলাই চন্দ্র তখন তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহী মহাবীর দলের সম্পাদক।

সংগী পেলেন শ্রীসত্য ব্যানার্জি, পুলিন রায় এবং নগেন ব্যানার্জি প্রভৃতি বিপ্লবীদের।

১৯২৪ সালে বিপ্লবীদের ইস্তাহার "রেড বেংগল" প্রকাশিত হতেই সরকার ব্যাপক হারে গ্রেপ্তার শুরু করলো। এবার বলাই চন্দ্র হাওড়া ডায়না ক্লাবের সদস্য হয়ে মেদিনীপুর বন্যাত্রাণে চলে গেলেন। পুলিশ সন্ধান করতে পারলো না। সেখান থেকে ফিরেই নেতা বিপিনদার নির্দ্দেশে খুলনা জেলার দৌলতপুর সত্যাশ্রমে আশ্রয় নিলেন। বিপ্লবী ভূপেন দত্ত (ছোট) তখন সত্যাশ্রমে যাতায়াত করতেন।

১৯২৭ সালে হাওড়ায় ফিরে প্রত্যক্ষভাবে শ্রমিক আন্দোলন সংগঠনে নেমে পড়লেন। বাড়ীর কাছেই হাওড়া জুট মিল। চটকলের শ্রমিকদের নিয়েই কাজ শুরু হল। ১৯২৮ সালের চটকল ধর্মঘটে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। পুলিশ নানাভাবে হয়রান করে। তারপর ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরই আত্মগোপন করতে হল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ধরা পড়তে হল বেংগল অর্ডিনান্স আইনে। হাওড়া জেল থেকে ১৯৩২ সালে বদলী করা হল প্রেসিডেন্সী জেলে। বিপিন গাঙ্গুলী, মণি সিং, কালীপদ মুখার্জি ইত্যাদির সংগেই জেলে ছিলেন। ১৯৩৪ সালে ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণায় অন্তরীণ করা হল, তারপর খালিয়াজুরী থানায়। সেখান থেকে জামালপুর হয়ে বহরমপুরের লালবাগ রাণীনগর থানায়ও অন্তরীণ থাকেন। অতিষ্ঠ হয়ে অন্তরীণ আইন ভংগ করলেন। বিচারে ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। প্রথমে রাজসাহী এবং পরে ঢাকা জেল। মেয়াদ শেষে ঢাকা জেলেই ডিটেনশন করে রাখা হল।

তখন রাজবন্দী বলে শ্রেণী বিভাগ বিশেষ করা হত না। অনেক সময় বেশী শাস্তি দেবার জন্য চতুর্থ শ্রেণীর বন্দীও করা হত। বলাই চন্দ্রকেও সেই দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছিল। ১৯৩৭

সালে নিজ জেলায় অর্থাৎ হুগলী জেলে বদলী করা হল। সেখান থেকে মুক্তি দিয়ে নিজ গ্রাম নতিবপুরে অন্তরীণ করা হল।

তখন সরকার ডেটিনিউদের বিভিন্ন প্রকার হাতের কাজ শেখাবার জন্য খড়দহের সুখচরে একটি ট্রেনিং ক্যাম্প খুলেছিল। বলাই চন্দ্র সুযোগ গ্রহণ করলেন। এক বৎসর ট্রেনিং নেবার পর মুক্তি দেওয়া হল ১৯৩৮ সালে।

সংগ্রামের নানা পর্যায়ে যাদের সংগে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকেই আজ পরলোকে। জীবিতদের মধ্যে আছেন শ্রীবীরেন ব্যানার্জি, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, শ্রীপুলিন রায়, সুশীল ব্যানার্জি, কানাই ব্যানার্জি প্রভৃতি।

দীর্ঘ ৪২ বৎসর স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে সক্রীয় অংশগ্রহণের জন্য দীর্ঘকাল কারাবাস এবং অন্তরীণ থেকেও তিনি নিরুৎসাহ না হয়ে পুনরায় শ্রমিক আন্দোলনে কাজ করতে থাকেন। সংগে সংগে সমাজহিতকর নানা প্রচেষ্টার সংগেও অদ্যাবধি নিজেকে যুক্ত রেখেছেন।

———

শ্রীপুলিন বিহারী রায় (৩)

বিংশ শতাব্দীর সূচনায় বাংলায় যে বিপ্লববাদ দানা বাঁধে তা যথাসময়ে বিহার এবং উত্তর প্রদেশ অতিক্রম করে পাঞ্জাবেও অনুপ্রবেশ করেছিল। সেই পাঞ্জাবেই জেনারেল ডায়ার জালি-ওয়ানয়ালাবাগের প্রবেশ পথে কামান বসিয়ে দলে দলে নিরস্ত্র নরনারীকে নৃশংসভাবে হত্যা করলেন ১৯১৯ সালে। সারা ভারতের মানুষ জেনারেল ডায়ারের অমানুষিক অত্যাচারে প্রথমটা হতভম্ব এবং তারপর প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। এই ঘটনায় বিপ্লবীদলের সৈনিকরা আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল ইংরাজকে দেশ থেকে বিতাড়ন প্রচেষ্টায়। বাংলাদেশ থেকে রাসবিহারী বসু, শচীন সান্ন্যাল, বটুকেশ্বর দত্ত এবং আরও অনেকে পাঞ্জাবে বিপ্লবীদলের সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। গিয়েছিলেন আরও অনেক তরুণ কর্মী। ১৯২৯ সালে হাওড়া থেকে পুলিন রায় একই উদ্দেশ্যে গিয়ে উপস্থিত হলেন লাহোর। সঙ্গে ছিলেন কালীপদ ভট্টাচার্য।

আমতা থানার বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম অমরাগড়ী। ৺উপেন্দ্রনাথ রায়ের পুত্র পুলিন ছোঠবেলা থেকেই ডাকাবুকো। হাওড়া শহরের ধরণীধর মল্লিক লেনের বাড়ীতে পুলিনের সংগী-সাথীদের ছিল আড্ডা। কুস্তি, লাঠি খেলার জন্য আখড়া এবং পাড়া প্রতিবেশীর সহায়তার জন্য শবদাহ ক্লাবের মাধ্যমেই পুলিন বিহারী যুব-সংগঠনে হাত দেন। বিপ্লবী নায়ক বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর দৃষ্টি এই সুগঠিত যুবকের দিকে আকৃষ্ট হল। অচিরে পুলিন বিহারীকে তিনি বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। প্রকাশ্যে অবশ্য কংগ্রেস পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলনই চললো।

১৯২১ সালে দেশবন্ধু নেতৃত্বে বড়বাজারে অসহযোগ আন্দোলনে প্রথম গ্রেপ্তার হয়ে ১ বৎসর ৩ মাস জেল খাটলেন। ৺চিররঞ্জন দাসের সংগে সাক্ষাৎ হয়। ১৯২৩ সালে শ্রীসত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগে চললেন তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক হয়ে। সেখানে পৌঁছেই মহাবীর দলের ক্যাপ্টেন নিযুক্ত হন। পুলিশ ধরলো এবং আবার ৩ মাস জেল। সেখানে তখন ছিলেন ৺সতীসাধন গায়েন, শ্রীভোলানাথ মাল এবং শ্রীবলাই চন্দ্র সিংহ প্রভৃতি। এই সময় বিদ্রোহী কবি নজরুলের সংগে পরিচয়। ১৯২৪ সাল বিপ্লবী নগেন মুখার্জির আহ্বানে তিনি হুগলী বিদ্যা-মন্দিরে কিছুদিন থাকার পর দলের নির্দেশে আসামের কামরূপ-কামাখ্যায় সংগঠনের কাজ করতে যান।

১৯২৫ সালে পুলিশ তল্লাসী করতে এলো। পূর্বাহ্নে সংবাদ পেয়েই সাধুর ছদ্মবেশে মেদিনীপুরে আত্মগোপন করলেন স্বামী প্রেমানন্দগিরি নামে।

১৯২৯ সালে বীর যতীন দাসের মরদেহবাহী (হাওড়া ষ্টেশন-কেওড়াতলা) বিরাট শোকযাত্রায় ছিলেন পুলিন রায়। পুলিশ পিছনে লেগেই আছে। এমন সময় দলের নির্দেশ—লাহোর যেতে হবে। লাহোর জেলের মধ্যে সর্দার ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্তর মামলা চলছে। জেল আক্রমণ করে বিপ্লবী বীরদের উদ্ধার করে আনতে হবে। লাহোর পৌঁছে রামগলি ধর্মশালায় আশ্রয় নিয়ে সুযোগ খুঁজছেন। পুলিশ ষড়যন্ত্র আবিস্কার করে ফেলেছে। একদিন ধর্মশালা ঘেরাও। পুলিন রায় এবং সহকর্মি বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পনে রাজী নন। গুলী বিনিময়ে আহত হয়ে ধরা পড়লেন।

গুলীর চেয়ে বেশী অত্যাচার পুলিশ কর্তৃক স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য। কলকাতার ইলিসিয়াম রো ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চে পুলিশের বীভৎস অত্যাচারের কথা অনেকেই জানেন। পাঞ্জাবের

পুলিশ বোধহয় তার চেয়েও বেশী নৃশংস। পুলিন রায়ের সামনে বিপ্লবী বীরাংগনা স্বদেশ কুমারীকেও সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে অত্যাচার তারা করেছে যতক্ষণ না সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। পুলিন রায়কেও একই অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। হাজতের পালা শেষ হল। বিচারে ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। "রামগলি বোমা কেস"।

কারাজীবনে একের পর একটি করে বাংলার বাইরের ৮টি জেলে ঘুরতে হয়। (১) লাহোর সেন্ট্রাল জেল, (২) মূলতান জেল, (৩) লায়ালপুর জেল, (৪) নিউ সেন্ট্রাল জেল মূলতান, (৫) ডিষ্ট্রীক্ট মূলতান জেল, (৬) রাওয়ালপিণ্ডি জেল, (৭) আমবালা জেল এবং শেষ পর্যন্ত আবার লাহোর জেল।

জেলের মধ্যে অনেক বিপ্লবী নায়কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। বিজয় সিন্‌হা, বর্তমানে সংসদ সদস্য কমলনাথ তেওয়ারী, সবরমতী আশ্রমের কৃষ্ণ আয়ার, অমর সিং, কোমীগোপাল সিং। গদর পাটির বলবন সিং, ডাঃ ভূপাল বসু, চোধুরী শের জঙ্গ, জাহাঙ্গীরী লাল, ইন্দ্রপাল প্রভৃতির সঙ্গে হৃদ্যতা হয়।

জেলের মধ্য কর্তৃপক্ষের ব্যবহারের বিরুদ্ধে অনশন করার আরও ৬ মাস বেশী কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল রাওলপিণ্ডি জেলে। মুক্তির ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পাঞ্জাব ত্যাগ করার নির্দেশ।

ফিরে এলেন হাওড়ার ১২।১, ধরণীধর মল্লিক লেনের বাড়ীতে। সেখানে অন্তরীণের আদেশ হল। এই সময় বরিশালের প্রখ্যাত নেতা সতীন সেনের সংগে যোগাযোগ হয়।

১৯৩৭ সালে উদ্যোগী হয়ে অন্নপূর্ণা ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। যুবসংগঠনের কাজ চলছে অন্যান্য সমাজ সেবামূলক কাজের সংগে। এই সময় তাঁহার সহিত হাওড়া জেলার প্রখ্যাত বিপ্লবী স্বর্গত প্রবোধ বসুর বিশেষ পরিচয় ঘটে। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নির্বাচিত হয়েও জনসেবা করেছেন ৺কার্ত্তিক চন্দ্র দত্তর সাথী হয়ে।

বিপ্লবী বারীন ঘোষের জন্মদিন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে পুলিন-বাবু বহু বিপ্লবীর সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন হাওড়া শহরে। বারীন ঘোষ একখানা তরবারী পুলিন রায়ের হাতে তুলে দিয়ে বলেন, "ভাবীকালের জন্য তোমার কাছে গচ্ছিত রইল"।

আজীবন বিপ্লবী পুলিন রায় একাত্তর বছর বয়সেও যুব-জনোচিত উৎসাহ নিয়ে সমান উদ্যমে নানা সেবামূলক কাজ করে চলেছেন।

কয়েক বছর আগে শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ মহারাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সমাজসেবার মধ্যদিয়েই আধ্যাত্মিক সাধনার পথ খুঁজে পেয়েছেন। জয়গুরু সম্প্রদায়ের গুরুভাইদের কাছে পুলিন বাবু বীরবাবা নামেই সমধিক পরিচিত। বর্তমান নিবাস ১।১, শরৎচন্দ্র বোস লেন, হাওড়া-১।

———

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য (৪)

সারা ভারতব্যাপী যখন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, বিলাতী দ্রব্য বর্জন আন্দোলন রাখি-বন্ধন প্রভৃতি আন্দোলনের জোয়ার লাগিয়াছে সেই সময় হইতেই অতি শৈশবেই, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য দেশমাতৃকাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। শ্রীভট্টাচার্য্য ১৯০০ সালে হাওড়া জেলার ডোমজুড় থানার দক্ষিণ ঝাপড়দহ গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ৺নীলমণি ভট্টাচার্য্য। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, ১৯২০ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে যে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হইয়াছিল, তাহাতে অংশগ্রহণ করিয়া বন্দী হন এবং তিনমাস কারাবরণ করেন। ১৯২৪ সালে কলিকাতায় "রেড বেঙ্গল" নামক সরকার বিরোধী যে ইস্তাহার বাহির হয়, তিনি তাহা প্রচারে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯২৪ সালে মির্জাপুর বোমার মামলায় তিনি ধৃত হন এবং পরে ছাড়া পান। ১৯২৬ সালে তাঁহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করিলে, তিনি তাহা এড়াইয়া বারাণসীতে আত্মগোপন করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতার চাঁদপাল ঘাটে ধরা পড়েন এবং প্রেসিডেন্সী জেলে নীত হন। পরে সেখান হইতে বাঁকুড়া জেলে এবং তথা হইতে যশোহর জেলে, পরে মৈমনসিং জেলে। মৈমনসিং জেলে থাকাকালীন তিনি বিপ্লবী যতীন দাসের সাক্ষাৎ পান। এই জেলে গোলমাল হওয়ায় তাঁহাকে ঢাকা জেলে প্রেরণ করা হয়, সেখান হইতে কলিকাতা সেন্ট্রাল জেল হয়ে রেঙ্গুণে প্রেরণ করা হয়। সেখানে তিনি বেসিন এবং মান্দালয়ের কারাগারে ছিলেন। ১৯২৯ সালের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে তাঁহাকে

বক্সা কেল্লায় আটক রাখা হয়। ১৯৩০ সালে স্বগৃহে অন্তরীণ হলেন। ১৯৩০ সালে মুক্তির পর আবার ১৯৩১ সালে হিজলি ডিটেনশান ক্যাম্পে আটক রাখা হয়। ১৯৩৫ সালে তাঁহাকে পুনরায় বন্দী করা হয় এবং ১৯৩৭ সালে মুক্তি দেওয়া হয়। এই সময়ে তিনি স্বগৃহে অন্তরীণ ছিলেন। শ্রীভট্টাচার্য তাঁহার রাজনৈতিক জীবনে যে সমস্ত বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বিপ্লবী শ্রেষ্ঠ মাষ্টার দা, ৺জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ, যতীন দাস প্রমুখ ব্যক্তিরা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বন্দী অবস্থায় বহু পুলিশী নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। তিনি যখন ব্রিটিশের জেলে ছিলেন, সেই সময় বিনা চিকিৎসায় তাঁহার দিদি ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা মৃত্যুমুখে পতিত হন। আজীবন বিপ্লবী শ্রীভট্টাচার্য ১৯৪৭ সালে জেলা বোর্ডের সভ্য নির্বাচিত হন। পরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভ্য নির্বাচিত হন। বার্ধক্যের ভারে জর্জরিত হইলে, আজও তিনি স্থানীয় বহু উন্নয়নমূলক কার্য্যের সংগে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখিয়াছেন।

—

শ্রীবীরেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (৭)

১৯১৯ সালে পাঞ্জাবের কুখ্যাত জালিয়ানওয়ালাবাগে অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের পর, সমগ্র ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণ যখন বিস্ময়ে ক্ষুব্ধ, তখন কিশোর বীরেন্দ্র কুমার ভারতমাতার এই চরম লাঞ্ছনা মোচনের সংগ্রামে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। জন্ম ১৯০৩ কুবলহাটী,-রাজসাহী জেলা (অধুনা বাংলাদেশ) ছাত্রাবস্থা কুমারখালী, নদীয়া জেলা (বাংলাদেশ), ১৯২২ সাল হইতে সালকিয়া, হাওড়ায়। তিনি রাজনৈতিক জীবনে বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার রাজনৈতিক সংগ্রামের পথ খুঁজিয়া পান। বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর নির্দেশে তিনি ইহাতে অংশগ্রহন করিয়া বড়বাজারে ১৯২১ সালে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে গ্রেফতার হইয়া ছয় মাসের জন্য কারাবরণ করেন। কারামুক্তির পর ১৯২৩ সালে তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উক্ত অভিযোগে তিনমাস কারাজীবনযাপন করিবার পর তিনি মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এখানে তিনি কাজী নজরুল, পুলিন রায়, বলাই সিংয়ের সহিত সবিশেষ পরিচিত হন। ইহার কিছুদিন পূর্ব হইতে তিনি পুরা-পুরি বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করিয়া শহীদ সন্তোষ মিত্র, স্বর্গিয় জ্যোতিষ ঘোষ, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, গিরীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিজন ব্যানার্জি, যতীন দাস, ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, মাষ্টারদা প্রভৃতি বিপ্লবীদের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন। ১৯২৫ সালে বিখ্যাত দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় জড়িত হইবার পর পলাতক অবস্থায় ধৃত হইয়া, বিচারের পর তাঁহাকে পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। এই সময় আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে থাকাকালীন ১৯২৬ সালের মাঝি-

মাঝি, আই. বি'র স্পেশ্যাল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট রায় বাহাদুর ভূপেন্দ্র চ্যাটার্জীকে হত্যার অপরাধে শহীদ অনন্ত হরি মিত্র ও প্রমোদ রঞ্জন চৌধুরীর সহিত ফাঁসীর হুকুম হয় এবং পরে আপীলে সন্দেহের অবকাশে তিনি বেকসুর খালাস পান। নভেম্বর মাসে লাহোর সেনট্রাল জেলে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। উক্ত জেলে দণ্ডভোগ কালে ১৯২৯ সালে রাজনৈতিক বন্দীদের সাধারণ সুযোগ সুবিধা আদায়ের দাবীতে শহীদ যতীন দাস, ভগৎ সিং প্রমুখের সহিত ৬২ দিন অনশন সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯৩০ সালের মে মাসে ছাড়া-পাবার সাড়ে তিন মাসের মধ্যেই বি, সি, এল-তে ধরা পড়েন। এই সময় বহরমপুর সেন্ট্রাল জেল, বক্সা ও দেউলি ক্যাম্পে দীর্ঘকাল আটক থাকার পর তিনি মুক্তিলাভ করেন। ১৯৪১ সালে নিষিদ্ধ পুস্তক রাখিবার অভিযোগে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হইয়া দমদম জেলে ১৮ মাস কারাবাস জীবনযাপন করেন। ১৯৫২ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। আজীবন বিপ্লবী শ্রীবীরেন্দ্র কুমার অকৃতদার। বর্তমানে কোন বিশিষ্ট রাজনৈতিক দলের সংগে সংযুক্ত না হলেও প্রগতিশীল চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ও স্থানীয় শিক্ষা ও বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কার্যে সংশ্লিষ্ট। বর্তমানে তিনি ৭ কৈকর্ত্তপাড়া লেন, সালকিয়া, হাওড়াতে বাস করেন। বীরেন্দ্র কুমার মোট ১৫ বৎসর ৩ মাস কারাবাস করিয়াছেন।

শ্রীগুরুদাস দত্ত (৬)

শিবপুরের স্বনামধন্য চিকিৎসক ৺ডাঃ বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত মহাশয়ের পুত্র গুরুদাসের জন্ম ১৮৯৪ সালে।

বাল্যকাল থেকেই নিজবাড়ী ৫নং হেম ব্যানার্জি লেনে নিত্য সমাগত নেতৃস্থানীয় নাগরিকদের সংস্পর্শে এসে রাজনৈতিক চেতনা লাভ করেন।

তখন কংগ্রেস পরিচালিত অহিংস আন্দোলনের পাশে পাশে বিপ্লবী দল অনুশীলন সমিতির কাজকর্ম চলছে। কিশোর গুরুদাস অনুশীলন দলে যোগ দিলেন। ব্যায়ামাগার এবং পাঠাগারের মাধ্যমে যুবকদের শরীর এবং মন মজবুত করে তোলা হচ্ছে। ১৯১৮ সালে কলেজ ছাত্র হিসাবে ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোর-এ যোগ দিয়ে রাইফেল চালনায় পারদর্শিতা লাভ করেন। সুভাষ বাবুর সহপাঠি ছিলেন স্কটিশ চার্চ কলেজে।

১৯১৯-২০ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রভৃতি নেতাগণ বঙ্গীয় জনসভা নামে একটি রাজনৈতিক সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। গুরুদাসবাবু এই সংস্থায় যোগ দিলেন। ১৯২০ সালে সক্রীয়ভাবে কংগ্রেসে যোগ দেন।

হাওড়ায় দেশীয় বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য 'স্বদেশী ভাণ্ডার' স্থাপিত হল। পরে এখানেই জেলা কংগ্রেসের পত্তন হল ৺অমৃত পাইন মহাশয়কে সভাপতি করে। তারপর সভাপতি হলেন ৺শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৯২০ সালে আইন অমান্যকারী প্রথম দলে ছিলেন। অনেককে গ্রেপ্তার করা হলেও গুরুদাসবাবু আত্মগোপন করে সংগঠনের কাজ করে চললেন। সেই সময় নিজ বাড়ীতে একটি তাঁতশালা খুলেছিলেন।

১৯২৩ সালে দেশবন্ধু স্বরাজ্য পার্টির পত্তন করেছেন। তখন হাওড়া কংগ্রেস অফিস গুরুদাসবাবুদের বাড়ীতেই অবস্থিত। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিসহ লোকাল বোর্ড এবং কাউন্সিলে ঢোকার জন্য প্রচণ্ড আন্দোলন চলছে। ৺বনবিহারী বসু ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ জনকল্যাণ কর্মী। কলকাতায় আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় সংকটত্রাণ সমিতির কর্মী হলেন গুরুদাস। নানাস্থানে বণ্যাদুর্গতদের সেবার জন্য ছুটে গেছেন।

১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত আইন অমান্য এবং অন্যান্য আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল নিজের বাড়ী। এই সময়ের মধ্যে তিন-বারে মোট আড়াই বছর কারাবাস করতে হয়।

কারামুক্তির পর হরিজন আন্দোলন এবং গ্রামীন শিল্প পর্ষদে কাজ করেন।

শ্রীশিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৭)

বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশের খুলনা জেলার ব্রাহ্মণ রাংদিয়া গ্রামের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ৺দ্বারকানাথ বেদান্তরত্নের পুত্র শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯৭ সালের ১১ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেন।

গ্রামের বিদ্যালয়ে পাঠ্যারম্ভ হলেও ১৯১৮ সালে হুগলী মহসীন কলেজ থেকে বি, এস, সি পাশ করেন এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এম, এস, সি পাঠ্যাবস্থায় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। পরে ইন্দোরে বিজ্ঞানের অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ডাকে সাড়া দিয়ে ১৯২১ সালে বাংলায় ফিরে এসে কংগ্রেস কর্মীরূপে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। কিছুদিন খুলনার বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠনের কাজে নিযুক্ত থাকার পর দৌলতপুর জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন।

১৯২২ সালে কাবুল (আফগানিস্থান) হাবিবিয়া কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক থাকাকালীন রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী স্বাধীন ভারতীয় সরকারে যোগ দেন। কিন্তু বৃটিশের চাপে যখন কাবুলে কাজ করা দুরূহ হয়ে পড়ে তখন মৌলানা ওবেই দুল্লার নেতৃত্বে ১০ জন বিপ্লবীর দলে মস্কো যাত্রা করেন। বিপদসংকুল পাহাড় পর্বত অতিক্রম করে তিনিই বাংলার প্রথম বিপ্লবী যিনি কম্যুনিজম সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ এবং সমাজতন্ত্রের ব্যবহারিক শিক্ষালাভের জন্য রাশিয়া যান। মস্কোতে দুই বছর শিক্ষালাভের পর আফগান ন্যাশনালরূপে জার্মাণী, অস্ট্রিয়া এবং লণ্ডনে ভ্রমণ করে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী এবং সেই সব দেশের সমাজতন্ত্রী নেতাদের সংগে সংযোগ স্থাপন করেন। ১৯২৫ সালে ভারত প্রত্যাগমন এবং শ্রমিক আন্দোলন সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। কংগ্রেসের মধ্যে থেকে ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস

সোসালিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। ভারত স্বাধীন হবার পর ১৯৪৮ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করেন।

শ্রমিক আন্দোলনেতে প্রথম কে, সি, মিত্রর (জটাধারী বাবা) নেতৃত্বে কাজ করেন। ১৯২৮ সালে শ্রমিক মিছিল পরিচালনা করে কলিকাতা কংগ্রেসে উপস্থিত হন। অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হলেন ১৯৩৪ সালে এবং সভাপতি নির্বাচিত হন ১৯৩৬ সাল।

১৯৩৬ এবং ১৯৪৬ সালে হাওড়া শ্রমিক কেন্দ্র থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক বিধান সভায় নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (I. L. O.) অধিবেশনে পরামর্শদাতারূপে যোগদান করে কানাডা ও আমেরিকার শ্রমিক নেতাদের সংগে সংযোগ স্থাপন করেন। লীগ অফ নেশনস্ সভায় যোগদান করে লণ্ডন হয়ে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের তীব্র বিরোধীতা করেন। বিভাগোত্তর ভারতে অগণিত ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

কারাজীবন ঃ— ১৯২৮ সালে শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে হাওড়া কোর্ট প্রাঙ্গণে ধৃত হয়ে ৯ মাস কারাদণ্ড।

জেলে থাকার সময় মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী করে মীরাট নিয়ে যায়। ৩ বছর জেলে থাকার পর জামিনে মামলার বিচারের শেষ বছর কাটে ও মুক্তিলাভ হয়।

১৯৪২ সালে ধৃত হয়ে হেবিয়াস কার্পাস মতে মুক্ত ঘোষণার সংগে সংগেই হাইকোর্ট প্রাঙ্গণের মধ্যে ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনে রাজবন্দী হিসাবে গ্রেপ্তার। ৩ বছর ৪ মাস পর প্রেসিডেন্সী জেল থেকে মুক্তি।

শ্রীবিভূতি ভূষণ ঘোষ (৮)

স্বাধীনতার আন্দোলনে জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য হলেও মহাত্মা গান্ধীই কংগ্রেসকে সংগ্রামী সংগঠনে পরিণত করেন। বাংলায় যখন বিপ্লব আন্দোলনের প্রতি যুবজনের প্রচণ্ড আকর্ষণ তখন গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় পরীক্ষিত অসহযোগ আন্দোলনের পথে কংগ্রেস কর্মী এবং দেশবাসীকে ডাক দিলেন। স্কুল, কলেজ ছেড়ে শিক্ষক ও ছাত্রদল বেরিয়ে এলেন, আইন আদালত এবং বহুক্ষেত্রে সরকারী চাকুরীর মায়া ত্যাগ করে যথাক্রমে আইনজীবিসহ অন্যরাও গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিলেন। নূতন এই সংগ্রামের ধার। তাই প্রস্তুতির জন্য চাই রীতিমত শিক্ষাক্রম।

বাগনান থানার বাঙ্গালপুর গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান বিভূতি ভূষণ ১৯২১ সালে কলকাতার কলেজ ত্যাগ করে গ্রামে ফিরলেন নূতন মন্ত্র নিয়ে। শিক্ষা শিবির খুললেন ৪০ জন কলেজ ছাত্র নিয়ে, এরাই পরবর্তীকাল বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা শিবির এবং ভলান্টিয়ার ক্যাম্প পরিচালনা করেছেন।

১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রাবল্য যখন সারা ভারতকে প্লাবিত করে চলেছে তখন বিভূতি ভূষণ বাগনানে স্বেচ্ছাসেবক ক্যাম্প চালু করলেন। এই শিবির থেকেই উলুবেড়িয়া মহকুমার বহু গ্রামের কংগ্রেস কর্মীগণ সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। বিভূতিবাবুর মন্ত্রশিষ্য শ্রীচণ্ডীদাস ঘোষ নিজগ্রামে শিবির খুলে ব্যাপক সংগ্রাম পরিচালনা করেন।

এই নেতৃত্বের সংবাদ পুলিশ জানতে পারে এবং বিভূতিবাবুকে গ্রেপ্তার করার জন্য সচেষ্ট হয়। কিন্তু বিভূতিবাবুও পুলিশের শ্যেন-

চক্ষু এড়িয়ে কাজ করে যান। অবশেষে ১৯৩০ সালের ১লা আগষ্ট পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়। আইন অমান্য আন্দোলনে সাধারণত ছয় মাসের কারাদণ্ডই হত কিন্তু নেতা বিভূতি ভূষণের অপরাধ সরকারের চোখে অনেক বেশী। তাই বিচারক দণ্ড বিধান করলেন ১৮ মাসের। জেলের অভিজ্ঞতা প্রজ্ঞাকে করে দিল প্রখরতর।

পরবর্ত্তীকালে আইন ব্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পাশে থেকেছেন এবং এখনও আছেন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দে সরকার (৯)

হাওড়া জেলার ১০১।১, নস্করপাড়া রোড, ঘুষুড়ী'র ৺হরিচরণ দে সরকার মহাশয়ের পুত্র শ্রীউপেন্দ্রনাথ দে সরকার মহাশয় (৭১), ১৯২১ সাল হইতে স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় স্থকিয়া ষ্ট্রীটে বোমার মামলায় তিনি গ্রেফতার হইয়াছিলেন। বিচারাধীন বন্দী হিবাবে এবং অন্তরীণ অবস্থায় আড়াই বৎসর অতিবাহিত করেন। তিনি মার্কসবাদে বিশ্বাসী। বর্ত্তমানে বার্ধক্যহেতু সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হিসাবে জীবনযাপন করিতেছেন।

শ্রীবসন্ত কুমার ঢেঁকী (১০)

হাওড়া জেলার ২১।৩, ব্যানার্জি বাগান লেন, সালিখা ৺হরিচরণ ঢেঁকীর পুত্র বসন্ত কুমার ঢেঁকী (৭২), ১৯২৩ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে জীবন শুরু করেন। ১৯২৪ সালে আগষ্টে মির্জাপুর বোমার মামলায় গ্রেপ্তার হন। কিছুদিন কেস

চলিবার পর তিনি মুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯২৪ সাল হইতে বৎসর নজরবন্দী অবস্থায় ছিলেন। ১৯২৬ সালে তিনি পুনরায় গ্রেফতার হন। ১৯২৩ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত একই চিন্তা লইয়া নানা অবস্থায় নানা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া জনগণের আন্দোলনের সংগে থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি মার্কসবাদে বিশ্বাসী। শারিরীক অবস্থার দরুণ তিনি এখন সম্পূর্ণরূপে নিস্ক্রীয়।

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত ঘোষ (১১)

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত ঘোষ (৭১), হাওড়া জেলার সালিখা নিবাসী ৺ননীলাল ঘোষ মহাশয়ের পুত্র ১৯২৪ সালে স্থানীয় বিপ্লবীদলের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি তাঁহার রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। ১৯২৮ সালে দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলায় ধরা পড়িয়া তিন বৎসর কারাবাস করেন। ১৯৩০ সালে হাজারীবাগ জেলে থাকাকালীন তদানীন্তন সি, ডি, মুভমেণ্টে বন্দী স্বর্গীয় বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, শ্রীকৃষ্ণ সিং প্রভৃতির প্রতি পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে ১ সপ্তাহ যাবৎ সফল অনশন সত্যাগ্রহে যোগদান করেন। তিনি লেখাপড়া করিবার বিশেষ সুযোগ পান নাই। একজন অভিজ্ঞ লেদম্যান হিসাবে তিনি তাঁহার জীবন অতিবাহিত করিতেছেন।

শ্রীঅরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১২)

শ্রীঅরুণ কুমার বন্দোপাধ্যায় ১৯০২ সালে হাওড়া শহরে ৪৩নং বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জী লেনে জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়টাকে মোটামুটি-ভাবে বলা যায় বিপ্লবের যুগ। ১৩।১৪, বৎসরের কিশোর অরুণ

বিপ্লবের আহ্বানকে অস্বীকার করতে পারেন নি। এই সময়ে তিনি চন্দননগরের বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। ১৯২০ সালে বালী শহরের এক ইংরাজী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকাকালীন তিনি তাঁহার স্বগৃহে সদ্য কারামুক্ত বিপ্লবীদের সম্বর্দ্ধনা সভার আয়োজন করিয়াছিলেন এবং এই অভিযোগ তিনি শিক্ষকতা হইতে বরখাস্ত হইয়াছিলেন। ১৯২০ সালে তিনি কংগ্রেসের একজন সক্রিয় কর্মী হিসাবে রাজনৈতিক প্রচারকার্য্যে গ্রামে চলিয়া গিয়াছিলেন। ১৯২২ সালে তিনি বিপ্লবী যুগান্তর দলের সংস্পর্শে আসেন। ১৯২১ সাল হইতে ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেস পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের অভিযোগে তাঁহাকে মোট পাঁচ বৎসর বন্দী জীবনযাপন করিতে হয়। ১৯৪২ সালের আগষ্ট বিপ্লবে অংশগ্রহণ করিবার অভিযোগে ভারতরক্ষা আইনে বিনা বিচারে তাঁহাকে কারাবাস করিতে হয়। এই সময় তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ১৯৩১ সালে বহরমপুর স্পেশ্যাল জেল এবং ১৯৩৩ সালে হিজলী জেলে তাঁহার উপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়। এই সকল জেলে অন্যায়ের প্রতিবাদে তিনি অনশন করেন। ১৯৩৩ সালে হিজলী জেলে তাঁহার উপর জেল আইনের সবরকম সাজা প্রয়োগ করা হয়। ডাণ্ডাবেড়ী, দাঁড়িয়ে হাত কড়া, চটের তৈয়ারী জেল পোষাক পরিধান প্রভৃতি। অনশনের সময় তাঁহাকে পাঁচদিন ধরিয়া জলস্পর্শ করিতে দেওয়া হয় নাই। জেলের এই সকল অমানুষিক অত্যাচারের ফলে তিনি এখন ভাল করিয়া দেখিতে ও কাণে ভাল করিয়া শুনিতে পান না এবং খুঁড়িয়ে চলাফেরা করেন॥

শ্রীঅনাদি মুখোপাধ্যায় (১৩)

হাওড়া জেলার ৮ সারদা চ্যাটার্জী লেন, কদমতলার অধিবাসী স্বনামধন্য শিক্ষক ৺সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীঅনাদি মুখোপাধ্যায় (৬৮) ১৯২৪ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষার পর দেশবন্ধুর ডাকে তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করিয়া ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেন। সত্যাগ্রহ আন্দলনে যুক্ত হইয়া ১৯২৪ সালে ইংরাজ পুলিশের হাতে ধৃত হন এবং ৬ মাস কারাজীবনযাপন করেন। বন্দী জীবনযাপনকালে তিনি শ্রীরামপুর, বর্দ্ধমান এবং বাঁকুড়া জেলে কারাবাস করেন। বাঁকুড়া জেলে অবস্থানকালীন পুলিশের অত্যাচারে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ক্ষতিগ্রস্থ হয়। শ্রীমুখোপাধ্যায় আজীবন গান্ধীবাদে বিশ্বাসী, ১৯৬৭ সালে অজয় মুখার্জি প্রতিষ্ঠিত বাংলা কংগ্রেসে যোগদান করেন। অতঃপর খাদ্য আন্দোলনে যুক্ত হইয়া কারাবরণ করেন। তাঁহার রাজনৈতিক জীবনে তিনি যাহাদের সংগে পরিচিত ছিলেন তাহাদের মধ্যে বিপ্লবী পুলিন রায়, বলাই সিংহ, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে অনাদিবাবু কোন রাজনৈতিক দলের সংগে নিজেকে যুক্ত না করিয়া অবসর জীবনযাপন করিতেছেন।

শ্রীসন্তোষ গাঙ্গুলী (১৪)

১৯১৯ সালে কুখ্যাত রাওলাট আইন ও জালিয়ানাওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর সারা দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন শুরু হইয়াছিল। ঠিক এমনই একটা মুহূর্তে শ্রীসন্তোষ গাঙ্গুলী, শ্রীবীরেন

বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌর দাস, সতীশ চ্যাং, লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীদের সহিত গুপ্ত সমিতি গঠন করিয়া ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজ সরকারকে উৎখাত করিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। শ্রীগাঙ্গুলী, ১৯০৬ সালে। ২, গদাধর ভট্টাচার্য্য লেন, সালিখা, হাওড়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতা ৺গোবিন্দ চন্দ্র গাঙ্গুলী। তিনি যখন, গুপ্ত সমিতিতে যোগদান করিয়া পুরোপুরি বিপ্লবী কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছেন, ইংরাজ পুলিশ সেটাকে মোটেই ভালো চক্ষে দেখিতে পারে নাই। ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে তাঁহাকে গ্রেফতার বরণ করিতে হয়। ডেটিনিউ হিসাবে কাটাই-বার পর ১৯২৮ সালের নভেম্বর মাসে তিনি মুক্ত হন। ১৯৩০ সালে তিনি পুনরায় গ্রেফতার হন, ১৯৩৮ সালের প্রথমে তিনি মুক্ত। এই সময় তাঁহাকে প্রেসিডেন্সী জেলে বন্দী জীবন কাটাইতে হয়। এখানে তাঁহার সহিত বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্বিনী গাঙ্গুলী, যোগেন চ্যাটার্জি প্রভৃতি বিপ্লবীরা ছিলেন। এখানে তাঁহার সহিত বিপ্লবী শিরোমণি মাষ্টার দা'র সহিত পরিচয় ঘটে। তিনি জেলে থাকাকালীন পুলিশের অকথ্য অত্যাচার সহ্য করিয়া-ছিলেন। এই বিপ্লবী ১৯২৬ সালে ধীরে ধীরে মার্কসবাদে আকৃষ্ট হন এবং আজও মার্কসবাদে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস আছে। ১৯৪৮ সাল হইতে ১৯৫১ সালে সিকিউরিটি বন্দী হিসাবে জীবন কাটিয়েছিলেন। এই সময় জেলের অভ্যন্তরে পুলিশের গুলি চালনার প্রতিবাদে তিনি অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদিগের সহিত অনশন করিয়াছিলেন। এখানে তিনি বিশিষ্ট নেতা মুজ্জাফর আহমেদের সহিত দমদম জেলে ছিলেন। আজীবন বিপ্লবী দেশমাতার একজন সুসন্তান।

শ্রীগৌর মোহন দাস (১৫)

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলন, বিশেষ করিয়া বাংলার বিপ্লবী শক্তির আন্দোলন যখন একটা চরম পর্যায়ে। সেই সময় শ্রীগৌরমোহন দাস নিজে একটা গুপ্ত সমিতির সহিত যুক্ত হইয়া ভারতমাতার পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। শ্রীগৌরমোহন দাস ১৯০৬ সালে ৯-১০, চক্রবর্ত্তি বাগান লেন, সালকিয়া, হাওড়াতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতা ৺আশুতোষ দাস। ১৯২৭ সালে সালকিয়া, হাওড়া—বোমার মামলায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের সময় তাঁহাকে নানাভাবে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন করা হইয়াছিল। তবুও তাঁহার মনোবল শত অত্যাচারের মধ্যেও অটুট ছিল। তাঁহার রাজনৈতিক জীবনে ১৯২৩ সালে যে গুপ্ত সমিতি সালকিয়াতে গড়িয়া উঠিয়াছিল তিনি তাহাতে বিপ্লবী বীরেন ব্যানার্জী, সতীশ চন্দ্র ঢ্যাং, গৌরমোহন দাস, বিজন ব্যানার্জি প্রমুখ বিপ্লবীদের সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন। আজিও তাঁহাদের রাজনৈতিক জীবনের সহিত তিনি যুক্ত আছেন। জেলে থাকাকালীন তিনি মার্কসবাদে বিশ্বাসী হইয়া উঠেন। আজিও তিনি একজন মার্কসবাদী হিসাবে, উক্ত আদর্শকে জীবনের মূলমন্ত্র করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। বর্তমানে গৌরমোহন স্থানীয় বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত নিজেকে যুক্ত রাখিয়াছেন।

শ্রীসুফল চন্দ্র মান্না (১৬)

হাওড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্গত খড়দহ গ্রামের ৺রাখাল চন্দ্র মান্নার পুত্র শ্রীসুফল চন্দ্র মান্না (৬৩) ছাত্রাবস্থাথেকেই দেশমাতৃকাকে বিদেশীর শৃঙ্খলের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিবার স্বপ্ন দেখিতেন। ছাত্রাবস্থায় হাওড়া জেলার প্রখ্যাত বিপ্লবী ৺সতীশ সাধন গায়েনের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি তাহার রাজনৈতিক জীবন শুরু করিয়াছিলেন। দেশবাসীকে ইংরাজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য স্বদেশী যাত্রাদল গঠগ করিয়া দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ১৯৩০ সালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করিয়া পুলিশ কর্তৃক ধৃত হন এবং ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। আজীবন গান্ধীবাদী শ্রীমান্না সম্পুর্ণরূপে পরনির্ভরশীল। বার্দ্ধক্যে হতাশ ও দিশাহারা শ্রীসুফল চন্দ্র মান্না চিন্তা করেন "জীবনে কি পেলাম।"

শ্রীচণ্ডীদাস ঘোষ (১৭)

বাগনানের অন্তর্গত মুগকল্যাণ সাহড়া গ্রামে ৺মতিলাল ঘোষের পুত্র চণ্ডীদাসের জন্ম হয় ১৯০৯ সালে। ১৯২৮ সালে কলেজ ছাত্র থাকার সময় সুভাষচন্দ্রের সংগে সংযোগ। ১৯৩০ সালে গান্ধীজীর ডাকে দেশব্যাপী অহিংস অসহযোগ, বিদেশী বর্জন এবং লবণ আইন অমান্য আন্দোলন সারা দেশে শুরু হয় তার ঢেউ হাওড়া জেলার বাগনান অঞ্চলে প্রসারলাভের পিছনে যে কয়েকজন তরুণ, নিষ্ঠাবান, আত্মত্যাগী সংগঠক এবং নেতার নাম জানা যায় তাদের প্রথম সারিতে ছিলেন শ্রীবিভূতি ভূষণ ঘোষ

(বাঙালপুর) এবং তাঁরই মন্ত্রশিষ্য মৃগকল্যাণ সত্যাগ্রহী শিবিরের অন্যতম সংগঠক শ্রীচণ্ডীদাস ঘোষ। বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে দলে দলে যুবকদের স্বাধীনতা আন্দলনেব জন্য সক্রীয় কর্মীরূপে গড়ে তোলেন। আজীবন দেশসেবার কাজে অক্লান্ত কর্মী হিসাবে যুক্ত।

১৯৩০ সালে দুইবার গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৩২ সালে আবার ধরা পড়েন। দুইবার বিচারে কারাদণ্ড হয় এবং মোট ১৩ মাস কারাবাস করতে হয়। বিভিন্ন সত্যাগ্রহ এবং আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার সময় এবং জেলের মধ্যেও কয়েকবার পুলিশের লাঠিচার্জে গুরুতররূপে আহত হন। স্বাধীনতা লাভের সময় বাগনান থানা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। তারপর থেকেই সংগঠনকর্মী হিসাবে দুর্ভিক্ষ, প্লাবন এবং সাধারণ মানুষের নানা অভিযোগের প্রতিকারের সংগ্রামে লিপ্ত আছেন। মৃগ-কল্যাণ গ্রাম সেবক সংঘ নামে প্রতিষ্ঠানটি তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। তিনি একজন নিরলস কর্মী, দেশ-হিতৈষী ও সমাজসেবী। বর্তমান তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর।

শ্রীবিভূতি ভূষণ ঘোষ (নান্নু) (১৮)

সুযোগ্য পিতা বিপ্লবী নায়ক ৺অতুল কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের যোগ্য পুত্র শ্রীবিভূতি ভূষণ ঘোষ ১৯১০ সালে উলুবেড়িয়ায় জন্ম-গ্রহণ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বাংলার বিভিন্ন স্থানে যে কয়েকজন দৃঢ়চেতা স্বাধীনতাকামী সংগঠকের মনে বিপ্লবীদল গঠনের চিন্তা প্রথম জাগে তাঁদের মধ্যে নতিবপুর জমিদার তনয় ৺অতুল কৃষ্ণ ঘোষ ছিলেন অন্যতম। ১৯০২ সালে এই সংগঠকদের মধ্যে ছিলেন ব্যারিষ্টার পি, মিত্র; সতীশ চন্দ্র বসু, অতুল কৃষ্ণ ঘোষ, ভগ্নী নিবেদিতা, সুরেন্দ্র মোহন ঠাকুর,

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, পুলিন দাস, অরবিন্দ ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (স্বামী নিরালম্ব) প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নায়কগণ। এই চিন্তানায়ক এবং সংগঠকগণ অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সারা বাংলায় বহু সমিতি গঠন করে তরুণদের দেহচর্চা এবং স্বাদেশিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত করা চলতে থাকে। ৺অতুল কৃষ্ণ ছিলেন বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী এবং লাঠিখেলা, অস্ত্রচালনায় তখন তাঁর সমকক্ষ, খুব কম বাঙ্গালীই ছিলেন।

এইরূপে স্বনাম ধন্য পিতার কাছে ৺যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী (বাঘা যতীন), ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী, রসিকলাল দাস, নগেন দত্ত, গদর পার্টির বাবা গুরুজিৎ সিং, দিনকর রাও, সুরেশ মজুমদার, পুলিন দাস, হেমন্ত বসু প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা বিপ্লবীর আনাগোনা বালক নানু প্রত্যক্ষ করে নিজের অজ্ঞাতসারেই বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। যথাসময়ে নিজেও শরীর চর্চা এবং লাঠিখেলায় পারদর্শী হয়ে ওঠে। ১৫ বছরের কিশোর নানু শারিরীক শক্তিতে অনেক যুবক অপেক্ষা বলবান।

১৯২৫ সালে বিপ্লবী শ্রেষ্ঠ সূর্য সেন (মাষ্টার দা) এবং রাইটার্স বিল্ডিং অলিন্দ যুদ্ধের নায়ক বিনয় বসুর সাক্ষাতেই পিতার নিকট বিপ্লবী মন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করলেন বিভূতি ভূষণ। তারপরই শুরু হল সংগ্রামী জীবন। আজ ৬২ বছর বয়সে উপনীত হয়েও সেই সংগ্রামী চেতনা এতটুকুও ম্লান হয় নি।

১৯২৭ সালে কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীটে ইংরাজ পুলিশ সার্জেন্টকে মারার অভিযোগে প্রথম ধরা পড়লেন। অভিযোগ প্রমাণ করা শক্ত হলেও ইংরাজ সরকার ৯ মাস প্রেসিডেন্সী জেলে আটক করে রাখে।

জেল থেকে বেরিয়েই চলে গেলেন ঢাকা জেলার বিক্রমপুর যশোলং গ্রামে প্রখ্যাত বিপ্লবী দীনেশ মজুমদারের বাড়ী। সেখান থেকে রাউতভোগ গ্রামে বিপ্লবী নায়ক বিনয় বসুর বাড়ী। ফেরার

পথে পুলিশ গ্রেপ্তার করলো অস্ত্র আইনে। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ১০ মাস কারাবাস করতে হল। মুক্তির আদেশ পেয়ে জেল গেটের বাইরে পা দেবার সংগে সংগেই আবার গ্রেপ্তার করে ঢাকা জেলার শ্রীনগর এবং পরে ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরে অন্তরীণ করে রাখা হল। ১ বছর ৪ মাস পর মুক্তি হল যেন আবার গ্রেপ্তার হবার জন্যই। ২৪ পরগণা জেলার চাংড়ীপোতায় স্বদেশী ডাকাতির সংগে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগে আবার ধরা পড়লেন ১৯৩৫ সালে। এবার কারাবাসের মেয়াদ হল ১ বছর।

পুলিশের হয়রানি এবং নির্যাতন এড়াবার জন্য বিপ্লবীদের একটা অংশ কংগ্রেসের প্রকাশ্য আন্দোলনে থাকতেন। নান্নুবাবু অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন প্রথম লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য। যথারীতি ধরা পড়ে ৬ মাসের জন্য কারাগারে যেতে হল। ১৯৩১ সালেও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য ১০ মাস কারাদণ্ড হয়।

১৯৩৮-৩৯ সালে গান্ধীজী এবং তাঁহার অনুগামী হাই কমাণ্ডের অসহযোগিতার জন্য সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস ত্যাগ করে ফরোয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠা করলেন এবং ডালহৌসী স্কোয়ারের পাশে ইংরাজদের মিথ্যা ইতিহাসের চিহ্ন হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনের ডাক দিলেন। নেতাজীর ডাকে প্রথম সাড়া দিয়েছিল হাওড়া জেলা। বিপুল সংখ্যক কর্মী নিয়ে উলুবেড়িয়ার সংগ্রামী নেতা নান্নু ঘোষ সুভাষচন্দ্রের পাশে দাঁড়ালেন। শীঘ্রই ইংরাজ সরকার তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখলেন। সুভাষচন্দ্র তখন বৃহত্তর সংগ্রামের কথা চিন্তা করছেন। তাঁরই নির্দেশে নান্নুবাবু একদিন অন্তরীণ অবস্থার মধ্যে গৃহত্যাগ করে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে গেলেন। আত্মগোপন করেই কাজ করে চলেছেন। সরকার পাঁচ শত টাকা থেকে শুরু করে সাড়ে সাত হাজার টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার ঘোষণা করলেন নান্নু ঘোষকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু সকলের প্রিয় নেতা নান্নুদাকে কে ধরিয়ে দেবে ?

ভারত স্বাধীন হবার পর ১৯৪৮ সালে নানুবাবু আত্মপ্রকাশ করলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আদর্শ এবং হাওড়া জেলার নেতা ৺হরেন্দ্র নাথ ঘোষের প্রেরণায় যে বৃহত্তর রাজনৈতিক আদর্শের জন্য তিনি সংগ্রাম শুরু করেছিলেন, আজও সেই আদর্শ অম্লান রেখেই সংগ্রাম করে চলেছেন। স্বাধীন ভারতে ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রার্থীরূপে বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং এখনও পর্য্যন্ত দলের সর্বভারতীয় নেতৃত্বের প্রথম সারিতেই অধিষ্ঠিত আছেন। পূর্বে উল্লেখিত জেল ছাড়াও হাওড়া, হুগলী, উলুবেড়িয়া, দমদম, আলীপুর সেন্ট্রাল, হিজলী এবং মেদিনীপুর জেলে কারাবাস করেন। জেল ওয়ার্ডারকে প্রহার করার অভিযোগে একবার অতিরিক্ত ৬ মাস জেল খাটতে হয়। জেলের মধ্যে সহবন্দীদের শরীর চর্চা বিশেষ করে লাঠিখেলা শিক্ষা দিয়েছেন।

শ্রীপ্রফুল্ল দাশগুপ্ত (১৯)

জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই ৺নেপাল চন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীপ্রফুল্ল দাশগুপ্ত ভারতব্যাপী অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যক্ষ করেন। জেষ্ঠতাত ঋষি নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত সর্বত্যাগী কংগ্রেস নেতা এবং অগ্রজ শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত অগ্রণী স্বাধীনতা সৈনিক। এই আদর্শের প্রভাবই মাত্র ১২ বৎসর বয়সে প্রফুল্ল কুমারকে সংগ্রামের পথে টেনে নিয়ে যায়। নিষিদ্ধ ইস্তাহার বিলি করার সময় গ্রেফতার হন। বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকা অবস্থায় আরও কয়েকবার স্বল্পকালীন কারাবাস হল সংগ্রামের পুরস্কার।

১৯২৯ সালে কলিকাতা কেশব এ্যাকাডেমি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সংগঠন তৈরী করে স্বদেশী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেন

এবং পিকেটিং পরিচালনা, সুতা কাটা এবং তাঁত চালানো (বিদ্যালয়ের মধ্যেই) প্রবর্তন করেন।

এই সময় ঢাকার বিপ্লবীদল শ্রীসঙ্ঘের (নেতা অনিল রায় এবং লীলা নাগ) স্থানীয় সংগঠক প্রফুল্ল কুমারকে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা দেন। উত্তর কলিকাতা ছাত্র সংস্থার নেতা ৺শচীন মিত্রের নেতৃত্বে ১৯৩০ সালে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন, শিবির ব্যবস্থাপনা এবং পিকিটিং-এ নেতৃত্ব করেন। অন্যদিকে ক্রীড়া সংস্থা, গ্রন্থাগার, সুইমিং ক্লাব ইত্যাদিতে সক্রীয় সদস্য এবং কর্মকর্তারূপে কাজ করার সময় বাছাই করা তরুণদের বিপ্লবীদলে সংগ্রহ করেন।

পুলিশের ওয়ারেন্ট ফাঁকি দিয়ে ৬ মাস দেশবন্ধুর গ্রাম তেলিরবাগসহ বিক্রমপুরের সর্বত্র প্রচারকার্যে ঘুরে বেড়াবার সময় লৌহজঙ্গ বাজারে মদের দোকানে পিকেটিং পরিচালনা করেন।

কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করে বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হবার এক বছর পর কলেজ ইউনিয়নের সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৩৩ সালে মেদিনীপুরের ইংরাজ জেলাশাসক বার্জ হত্যা-কাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সন্দেহে সারারাত্রি গৃহ তল্লাসের পর ধৃত হন। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য ইলিসিয়াম রো পুলিশ গোয়েন্দা বিভাগে বহু অত্যাচার সহ্য করতে হয়। বিচারাধীন বন্দীরূপে প্রেসিডেন্সী জেলে ছিলেন। কয়েকমাস পর হত্যা মামলা হতে অব্যাহতি পেলেও আটকবন্দী হিসাবে প্রেসিডেন্সী জেলেই থাকতে হয়। ১৯৩৪ সালে মুক্তি পাবার পর থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১৯৬০ সাল থেকে "বিচার" সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ এবং সম্পাদনা করেন। নানা সাহিত্য সম্মিলনে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

হাওড়া এবং কলকাতার বহু সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু সংগঠনের কার্যকরী সমিতির

মাধ্যমে জনকল্যাণমূলক কাজে নিযুক্ত আছেন। হাওড়া রোটারী ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীদাশগুপ্ত স্থানীয় প্রাচীন ঐতিহ্যসম্পন্ন হাওড়া সেবা সংঘের বর্তমান সভাপতি। বর্তমান বয়স ৬০ বছর। ১১নং হেম চক্রবর্তী লেন ঠিকানায় বাস করেন।

শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (২০)

আজীবন বিপ্লবী শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯১৪ সালে ৩৭ নং বৈকুণ্ঠ চাটার্জী লেন, হাওড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ৺হরিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ইষ্টার্ণ রেলওয়ের প্রিন্টিং বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় অতি শৈশবেই মাতৃসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা বিপ্লবী পুলিন রায়ের সান্নিধ্যে আসিয়া নিজেকে দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে ব্রতী করেন। এই সময় শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্ত, ভগৎ সিং-এর সহিত তাহার পরিচয় ঘটে। ১৯২৯ সালে লাহোর রামগলি বোমা বিস্ফোরণ কেস-এ পুলিশ তাঁহার বাড়ী তল্লাসী করিয়া তাঁহাকে গ্রেফতার করে, ১৫ দিন হাজত বাসের পর প্রমাণ অভাবে মুক্তি পান। এই সময় বাংলার শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে গঠিত আত্মোন্নতি সমিতির সক্রিয় সদস্য হিসাবে দীর্ঘদিন আত্মগোপন করিয়া হাওড়া, কলিকাতা, মেদিনীপুর, হুগলী, বেনারস প্রভৃতি স্থানে বিপ্লবী কর্মে রত ছিলেন। ১৯৩০ সালে রাজসাহীতে বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলন হইতে ফিরিবার পথে শিয়ালদহ ষ্টেশনে তিনি গ্রেফতার হন। শিবপুর বোমা মামলার সহিত জড়িত থাকিবার অভিযোগে তাঁহার বিরুদ্ধে বিচার হয়, প্রমাণ অভাবে তিনি মুক্ত হন। অতঃপর বিলাতী কাপড়ের দোকান ও মদের দোকান পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে পুনরায় তিনি গ্রেপ্তার হন।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে পরে তিনি ছাড়া পান। আত্ম-গোপনকারী হিসাবে আর্থার মুর নামে নিজেকে পরিচয় দিয়া রাইটার্স বিল্ডিং-এ ১নং ব্লকে ইলেক্‌ট্রিক বিভাগে কর্মরত ছিলেন। ১৯৩১ সালে হাওড়া বঙ্গবাসী সিনেমা হল থেকে তিনি গ্রেপ্তার হন। তাঁহার বিরুদ্ধে এক্সোপ্লোসিভ্‌ এ্যাক্ট, পাতিহাল বোমা কেস প্রভৃতির অভিযোগ আনিয়া হাওড়া আদালতে তাহার বিচার হয় এবং তিনি পরে মুক্তিলাভ করেন। পুনঃ তাহাকে বেঙ্গল অর্ডিনান্স আইনে গ্রেপ্তার করা হয় এবং প্রেসিডেন্সি থেকে ১৯৩২ সালে তাঁহাকে বহরমপুর বন্দী শিবিরে স্থানান্তরিত করা হয়। তিনি ১৯৩৩ সালে হিজলী বন্দী শিবিরে আটক থাকে। ১৯৩৪ সালে নোয়াখালি জেলার কোম্পানীগঞ্জের চরকাঁকড়ায় অন্তরীণ হন। অন্তরীণ আইন ভঙ্গের জন্য তাঁহাকে নোয়াখালি জেলে আটক করে বিচার করা হয় এবং একবৎসর সশ্রম কারা-দণ্ড দিয়া কুমিল্লা জেল হইতে তাঁহাকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। জেলের ভিতরে পুলিশ তাঁহার উপর অকথ্য অত্যাচার করেন তার পরিণতি হিসাবে তাঁহার দক্ষিণ হাত এবং পা সম্পুর্ণরূপে অকেজো হইয়া পড়ে। কলিকাতার মেডিকেল কলেজ হসপিটালে চিকিৎসার পর বঙ্গোপসাগরে সন্দীপ নামক স্থানে অন্তরীণ করা হয়। ১৯৩৭ সালে ২৫শে নভেম্বর সরকারী আদেশ অনুযায়ী তাঁহাকে স্বগৃহে অন্তরীণ করা হয়। ১৯৪২ সালে ভারত-ছাড় আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে নোয়াখালিতে গান্ধীজীর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখিবার জন্য যে সমিতি গঠিত হইয়াছিল তিনি তাহার সক্রিয় সদস্য হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন। বর্তমানে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় স্থানীয় উন্নয়নমূলক কর্মে নিজেকে নিযুক্ত রাখিয়াছেন। হাওড়া জাতীয় বিদ্যামন্দিরে অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে এই বিদ্যালয়কে প্রাথমিক স্তর হইতে মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করিয়াছেন।

শ্রীবিভূতি ভূষণ আদিত্য (২১)

কলকাতায় সিমলা ব্যায়াম সমিতির নাম জানে না তখন এমন লোক ছিল না। আর সিমলা ব্যায়াম সমিতির সভ্যকালেই স্বদেশী আন্দোলনের সৈনিক। বিভূতিবাবু এই সিমলা ব্যায়াম সমিতিতেই উলুবেড়িয়ার স্বনামখ্যাত অতুল চন্দ্র ঘোষের কাছে লাঠিখেলা শিক্ষা করেন এবং পারদর্শিতা লাভ করে পরবর্তীকাল নিজেই বহু ছেলেকে তৈরী করেন। বাগনান থানার কাঁশড়া গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান বিভূতি ভূষণ বাল্যকালেই পিতার কর্মস্থান কলকাতায় লেখাপড়ার জন্য গেলেন। পিতা ৺ফকিরচাঁদ আদিত্যর কাছেই পেয়েছিলেন স্বাধীনতার প্রথম পাঠ। বন্ধু-বান্ধব কয়েকজনে মিলে গড়ে তুলেছিলেন "মদন মোহন লাইব্রেরী" মদন ঘোষ লেনের ২নং বাড়ীতে। তারপর ১৯২৫ সালে শ্রীঅমর বসু আখড়া খুললেন সিমলা ব্যায়াম সমিতি। বাছা বাছা ছেলেরা জুটলো সেখানে। ইংরাজ সরকার অমর বসুকে গৃহবন্দী করে রাখলো কিন্তু তাঁর আদর্শকে রূপায়িত করার দায়ীত্ব নিলেন সিমলা ব্যায়াম সমিতির শিক্ষক এবং সভ্যরা। পাড়ায় নানা জনকল্যাণকর প্রচেষ্টার মাধ্যমে পল্লীবাসীর মন জয় করলো সিমলা ব্যায়াম সমিতি। ৺সুধীর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগোষ্ঠ-বিহারী শেঠ ইত্যাদি ছিলেন বিভূতিবাবুর সহকর্মী। পুলিশের তাড়ায় বাংলাদেশ ছেড়ে বাইরে পালাতে হল।

১৯২৭ সালে বিবাহ এবং মেদিনীপুর জেলার গিড্নীতে চাকুরীতে যোগদান। ১৯৩১ সালে মেদিনীপুর শহরে বিপ্লবীরা সক্রীয় হতেই পুলিশ বিভূতি ভূষণকে মেদিনীপুর জেলা ত্যাগ করার আদেশ দিল। দেশে ফিরে ১৯৩২ সালে মুনটিয়া হাটে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে গ্রেপ্তার হন এবং ৯ মাস কারাদণ্ড হয়। মুক্তির পর বাইনান কংগ্রেসের সক্রীয় সদস্য হিসাবে কাজ করেন।

শ্রীকমলাকান্ত শ্রীমানী (২১)

মাকড়দহ শ্রীমানীপাড়ার ৺উদয় নারায়ণ শ্রীমানীর পুত্র শ্রীকমলাকান্ত শ্রীমানী বিপ্লবী কর্মী হিসাবে কালাপানি ঘুরে এসেছেন। বর্তমান বয়স ৭১ বছর। অধিকাংশ স্বাধীনতা সংগ্রামীর মতই কমলাকান্ত ১৯৩০ এবং ১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন এবং দু'বার কারাবরণ করে যথাক্রমে ৫ মাস এবং ৬ মাস কারাবাস করেন। এই সময় বিপ্লবী সন্তোষ মিত্রর সংস্পর্শে এসে সশস্ত্র বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৯৩৪ সালে কার্তুজসহ একটি রিভলবার নিয়ে যাবার সময় কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সামনে গ্রেপ্তার হলেন। পুলিশ হাজতে নির্যাতন শেষে বিচার হল ১৯ এফ (অস্ত্র আইন) ধারা অনুযায়ী। ৫ বছরের সাজা এবং আন্দামান দ্বীপান্তর আদেশ হল। ১৯৩৫ সালে পাঠানো হল আন্দামান। আন্দামান জেলের মধ্যে আইন ভঙ্গ করার অপরাধে আরও ৬ মাস সাজা হল। গুরুতররূপে অসুস্থ হয়ে পড়ায় প্রেসিডেন্সী জেলে ফিরিয়ে নিয়ে এসে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করে দেওয়া হল। তিনবার অপারেশন করার পরও রোগ মুক্ত না হওয়ায় সরকার মুক্তি দিল।

বর্তমানে হৃদরোগ এবং চক্ষুরোগে ভুগছেন। নিয়মিতভাবে মেডিক্যাল কলেজেই চিকিৎসা চলছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজনৈতিক পেন্সন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আন্দামান বন্দী পেন্সন পাচ্ছেন।

শ্রীসুধীর কুমার রায় (২৩)

অমরাগড়ি অঞ্চলের কাঁকরোল গ্রামে শ্রীসুধীর কুমার রায় ১৯০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ৺সুরথ চন্দ্র রায়। চিকিৎসা

বিদ্যা অধ্যয়নকালে কলিকাতায় স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হলেও আরামবাগে চিকিৎসক হিসাবে কর্মরত থাকার সময় শ্রদ্ধেয় নেতা শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেনের প্রেরণাতেই ৪২ আন্দোলনে যোগ দেন। নিজস্ব ডাক্তারখানায় স্বেচ্ছাসেবক এবং নেতাদের মিলন-পরামর্শের স্থান ছিল। বন্যাপ্লাবিত আরামবাগে সেই আন্দোলনের সময় গ্রেপ্তার হলেন। পুলিশ হাজতে একমাস থাকার পর বিচারে ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। বন্দী অবস্থায় থাকার সময় দ্বিতীয় মামলায় আরও ২ বছর কারাদণ্ড হয়। জেলের মধ্যে হাসপাতালে কাজ করেন। শ্রীরতন-মণি চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীসতীশ দাশগুপ্তর সংগে ছিলেন। তখন একদিকে দুর্ভিক্ষ চলছে এবং যুদ্ধও চলছে। বন্দীদের অখাদ্য চালের ভাত দেবার প্রতিবাদে অনশন করেন। জেলের মধ্যে কারারক্ষীদের লাঠিচার্জের শিকার হন। বর্তমানে ১৭।১৪ কাশী-রাম দাস রোড, দুর্গাপুর-৫, বর্দ্ধমান, ঠিকানায় বসবাস করেন।

শ্রীঅরবিন্দ গায়েন (২৪)

অন্তরের প্রেরণায় দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে শ্রীঅরবিন্দ গায়েন নিজেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসর্গ করিয়া-ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ গায়েন (৬৮), ১৯০৪ সালে হাওড়া জেলার, জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত মাজু গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। পিতা ৺কালীপদ গায়েন। খুল্লতাত স্বর্গত সতীশধন গায়েন একজন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। ১৯৩০ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারাভারতে যখন আইন অমান্য আন্দোলন ও লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলন শুরু হইয়াছিল শ্রীগায়েন উহাতে যোগদান করিয়া তাঁহার স্বগ্রামে গ্রেপ্তার বরণ করেন। হাওড়া এস, ডি. ও কোর্টে তাঁহাকে আনা হইলে তিনি অতঃপর

রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা দান করেন এবং উক্ত অভিযোগে তাঁহাকে ছয়মাস কারাবরণ করিতে হয়। একমাস পরে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট বিচার করিয়া এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। অতঃপর গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুযায়ী মুক্তি পান। এই সংগ্রামী জীবনে যাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তন্মধ্যে স্বর্গত শরৎ বসু, কালী মুখার্জী, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। জেলে বন্দী থাকাকালীন তাঁহার উপর অকথ্য অত্যাচার করা হয় এমনকি তাঁহার পরিবারের উপরও অত্যাচার কম হয় নাই। উপায়ান্তর না দেখিয়া, তিনি তাঁহার পরিবারের সহিত কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া এজাহার দিয়াছিলেন। এই সংগ্রামী বর্তমানে অতীব আর্থিক কষ্টের মধ্যে দিন অতিবাহিত করিতেছেন। (প্রাক্তন বিধান সভার সদস্য)

শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (২৫)

আন্দুল মৌড়ীর কাছে মাশিলা গ্রাম। স্বাধীনচেতা দেশপ্রেমিক ৺সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শরৎচন্দ্র স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন।

১৯৩২ সালে সাঁকরাইল থানার পুলিশ এসে বাড়ী ঘেরাও করলো। দরজা ভেংগে বাড়ীতে ঢুকে থানা তল্লাসীর নামে ঘটিবাটি এমন কি গরু বাছুর পর্য্যন্ত নিয়ে গেল। বাবা সুরেন্দ্রনাথের চোখের সামনে পুত্রকে ধরে নিয়ে গেল। স্বাধীনচেতা পিতা নিঃশব্দে সহ্য করলেন। তিনি পুত্রের বিবাহে কোনরকম যৌতুক গ্রহণ করেন নি। শাঁখা সিন্দুর শোভিত পুত্রবধূকে গৃহে এনেছিলেন। তখনকার দিনে সমাজ সংস্কারে একটি বলিষ্ঠ প্রয়াস।

১৯৩১ সালে ৺পুলিন বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় তিন দিনব্যাপী রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করেন আন্দুলে। বন্ধু ডাঃ কানাইলাল গাঙ্গুলীর মাধ্যমে জে, এম, সেনগুপ্ত, ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত এবং ৺বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ের সংগে সংযোগ স্থাপিত হয়।

১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে নিজ অঞ্চলে নেতৃত্ব দেন। আন্দুল দক্ষিণ পাড়ার আনন্দমঠ মাঠে ১৪৪ ধারা ভংগ করে সভার আয়োজন করা হয়েছে। নিয়ম মাফিক পুলিশ অত্যাচারের সম্মুখীন হবার জন্য সবাই তৈরী। কিন্তু দারোগা পঙ্কজ চট্টোপাধ্যায় (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র) কোন অত্যাচার না করেই গ্রেপ্তার করলেন। বিচার ৬ মাসের কারাদণ্ড। জেলে থাকার সময় সংবাদ পাওয়া যায় যে পিতার উপর পুলিশ প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে কিন্তু পিতা পুত্রের রাজনৈতিক কার্যকলাপকে পূর্ণ-ভাবে সমর্থন করেন।

শ্রীবলাই চন্দ্র দাস (১৬)

পিতা ৺বিনোদ বিহারী দাস, গ্রাম ও পোঃ তুইলা, সাঁকরাইল, হাওড়া। প্রথমে কংগ্রেস পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান। পরে বিপ্লবী নায়ক বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর সংস্পর্শ-লাভ। স্বেচ্ছাসেবকরূপে কলিকাতা টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের সভায় যোগদান করে পুলিশের লাঠিচার্জে আহত। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং দেশ গৌরব সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আন্দোলনে অংশগ্রহণ। ১৯৩০ সালের ৯ই আগষ্ট আন্দুল বাজারে পিকেটিং করার সময় গ্রেপ্তার এবং ৬ মাস কারাদণ্ড। প্রেসিডেন্সি জেলে হাংগামার জন্য আরও একমাস দমদম জেলে কারাবাস।

, বিভিন্ন সময়ে সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন—শ্রীবিভূতি ঘোষ (নান্টু), শ্রীঅরুণ ব্যানার্জী, সতীসাধন গায়েন, হরিদাস মিত্র (বর্তমান ডেপুটি স্পীকার), অজিত ঘোষ, রবি বোস, প্রফুল্ল মুখার্জি প্রভৃতি দেশ সেবকগণ। বর্তমান বয়স ৬৭ বছর।

শ্রীবিষ্ণুপদ খাঁড়া (২৭)

পিতা ৺নারায়ণ চন্দ্র খাঁড়া, গ্রাম ঃ খালোড়, পোঃ রামচন্দ্রপুর. বাগনান, হাওড়া। (বয়স ৬৭ বৎসর)

বাগনানের বাঙ্গালপুর গ্রামে "লাঙ্গল যার জমি তার" আন্দোলন ১৯৩০ সালে ব্যাপক আকার ধারণ করে। বিভূতি-বাবুর নেতৃত্বে গ্রামবাসীদের সংগে আন্দোলনে যোগদানের ফলে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার ও নির্যাতন। বিচারে ৬ মাসের কারাদণ্ড। বর্তমানকাল পর্যন্তও নানাপ্রকার জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ।

শ্রীধরণীধর মাইতি (২৮)

১৯০৫ সালে বাগনান থানার রামচন্দ্রপুরে জন্ম। পিতা ৺মাখনলাল মাইতির সংগে পাঠশালায় পাঠ্যাবস্থা থেকেই চাষের কাজে নেমে পড়েছিলেন। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের ডাকে এগিয়ে এলেন বিভূতিবাবুর শিবিরে। দেশ স্বাধীন না হলে কৃষকদের ভবিষ্যৎ উন্নতি হবে না—এই কথা অন্তরকে স্পর্শ করে বাড়ী থেকে পালিয়ে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে মাজুতে সতীসাধন গায়েনের অধীনে কাজ আরম্ভ। পিকেটিং করতে গিয়ে ধরা পড়ে ৭ মাস জেল খাটতে হয়। ১৯৩০ সালে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য যে সংকল্প করেছিলেন স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত তা পালন করেছেন।

শ্রীসত্যচরণ গিরি (২৯)

হাওড়া জেলার বাগনান থানার অধীনে খাজরনান গ্রামে ৺রাখাল চন্দ্র গিরির পুত্র ১৯০৫ সালে এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আজীবন নিরক্ষর শ্রীগিরি শ্রীচণ্ডীদাস ঘোষের প্রভাবে ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৩০ সালে, খুণ্টিয়াহাটে (বাগনান থানা)` ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়া গ্রেপ্তার হন এবং ছয় মাস কারাবরণ করেন। ১৯৩২ সালে মদ, গাঁজার দোকানে পিকেটিং করিবার অভিযোগে দ্বিতীয় বার গ্রেপ্তার হন। এবার তিনি সাত মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। অতঃপর তিনি হরিজন আন্দোলন, মাদক দ্রব্য বর্জন আন্দোলন হিন্দু মুসলমান ঐক্য আন্দোলনের সাহিত নিজেকে যুক্ত করেন। বন্দী থাকাকালীন তিনি শ্রীবিভূতি ভূষণ ঘোষ (নান্তু) এর সংস্পর্শে আসেন। আদর্শনিষ্ঠ কর্মী শ্রীগিরি ভাবেন -"কি চেয়েছিলাম আর কি পেয়েছি"।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য (৩০)

পিতা ৺ননীগোপাল ভট্টাচার্য্য, নিবাস ৪৯০/২৬. সার্কুলার রোড, শিবপুর। বর্তমান বয়স ৬৭ বছর।

বালক বয়সে তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে হাতে খড়ি। কুড়ি বছর পূর্ণ হবার আগেই ৺সতীন সেন মহাশয়ের নেতৃত্বে পটুয়াখালি সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে ৬ মাস কারাবরণ করেন। ১৯২৯ সালে নেতা ৺হরেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং সাহিত্য সম্রাট শরৎচন্দ্রের নেতৃত্বে লবণ আইন অমান্য করে আবার ১ বছর কারাবাস।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, দমদম স্পেশাল জেল এবং প্রেসিডেন্সি জেলে রাখে। বেরিয়ে এসেই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলেন। জেল হল ৬ মাসের। এবার জেলের মধ্যে সাক্ষাৎ হল সুভাষচন্দ্র এবং যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সংগে। জেলের মেয়াদ শেষে ফিরে এসেই মদের দোকানে পিকেটিং। ১৯৩২ সালে জেলে দর্শনলাভ হল স্বনাম ধন্য ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের।

৪ বার কারাদণ্ড ভোগ করার পর সংসারের দুরবস্থার জন্য চাকুরীর চেষ্টায় কয়েক জায়গায় ঘোরাঘুরির পর গেষ্ট কিন কোম্পানীতে চাকুরী হল। ৪২ সালের আন্দোলনে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেন। ৮ বছর ইচ্ছাপুর মেটাল এবং ষ্টীল ফ্যাক্টরীতে চাকুরী এবং পরে আরও কয়েক স্থানে কাজ করে ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

শ্রীশরৎ চন্দ্র ওঝা (৩১)

শ্রীশরৎ চন্দ্র ওঝা (৬৬) হাওড়া জেলার আমতা থানার অধীন শারদা গ্রাম নিবাসী ৺অতুলচন্দ্র ওঝার পুত্র, একজন একনিষ্ঠ গান্ধীবাদী হিসাবে নিজেকে ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে যুক্ত করেন। হাওড়া শহরে হরেন ঘোষ মহাশয়ের ক্যাম্পে তিনি নিজের নাম লেখান। অতঃপর ধূলোগোড়ে গাঁজার দোকানে ১৯৩০ সালে পিকেটিং করবার দরুণ গ্রেপ্তার হন এবং তিনমাস কারাবাস জীবনযাপন করেন। জেল হইতে ছাড়া পাইবার পর পুনরায় তিনি ক্যাম্পে আসেন এবং সভা, শোভাযাত্রা প্রভৃতিতে যোগ দেন। ১৯৩২ সালে হাওড়া শহরে সম্মেলন করিবার সময় পুলিশের হাতে ধৃত হন এবং ছয়মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। জেল হইতে মুক্ত হইবার পর স্থানীয় জমিদারদের কুৎ-খামর নামে কুখ্যাত চাষী ঠকানো প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া নির্য্যাতন

ভোগ করেন। বর্তমানে তিনি স্থানীয় জনহিতকর কর্মে ব্রতী আছেন।

শ্রীনন্দলাল সরকার (৩২)

পিতা ৺অতুল চন্দ্র সরকার গ্রাম ও পোঃ মুগকল্যাণ, বাগনান, হাওড়া। ১৯৩০ সালে শ্রীচণ্ডীদাস ঘোষ মহাশয়ের নেতৃত্বে যে বিলাতী দ্রব্য বর্জন এবং মাদকদ্রব্য ব্যবহার বন্ধ করার আন্দোলনে সক্রীয় কর্মী হিসাবে ১৯৩০ সালে গ্রেপ্তার হয়ে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। বয়স ৬৬ বৎসর।

শ্রীঅনঙ্গ মোহন পাণ্ডা (৩৩)

বাগনানের ৺গোষ্ঠবিহারী পাণ্ডার পুত্র শ্রীঅনঙ্গমোহন পাণ্ডার জন্ম ১৯০৭ সালে। বিপ্লবী আন্দোলন এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের কাল তখন। সেই ধারায় মানুষ হওয়া অনঙ্গমোহন ছাত্রাবস্থায় প্রথম শিবগঞ্জের লবণ সত্যাগ্রহে যোগদান করেন। নেতা ছিলেন সেণ্টপলস্ কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক এবং পরবর্তীকালে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ শিবপুর নিবাসী শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য। শিবগঞ্জে পুলিশ গ্রেপ্তার করে মারধর করে ছেড়ে দিল। আর ঘরে ফেরা নয় মুগকল্যাণ সত্যাগ্রহী শিবির। শিবির :অধ্যক্ষের নিকট আন্দোলন সম্পর্কে শিক্ষালাভ এবং তাঁরই নির্দেশে কর্মী সংগঠন এবং পিকেটিংয়ে আত্মনিয়োগ। আনটিলা মদের দোকানে পিকেটিং করার সময় গ্রেপ্তার এবং ৬ মাসের কারাদণ্ড।

মুক্তির পর আবার বিদ্যায়তনে যোগদান।

শ্রীপূর্ণ প্রসাদ মিত্র (৩৪)

১৯০৮ সালে কলিকাতায় কালিঘাটে জন্ম। পিতা ৺আশুতোষ মিত্র। ৭ বছর বয়সে সালিখায় আসেন। বর্তমান ঠিকানা ৮৪নং শ্রীরাম ঢ্যাং রোড, হাওড়া-৬।

১৯২৫ সালে রেলের এপ্রেনটিস হিসাবে চট্টগ্রামের পাহাড়-তলীতে কাজে যোগদানের কিছুদিনের মধ্যেই চট্টগ্রামের বিপ্লবী গোষ্ঠির সংস্পর্শে আসেন। পুলিশের দৃষ্টি শীঘ্রই পড়লো। ফলে আত্মগোপন। সীতাকুণ্ড তীর্থ যাত্রীদের ভিড়ে আত্মগোপন করে ৩০।৪০ মাইল পায়ে হেটে চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন। ১৯২৯ সালে সালিখায় প্রত্যাবর্তন। তখন কংগ্রেস পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলন চলছে। স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ এবং আন্দোলন পরিচালনায় লেগে গেলেন। পুলিশ গ্রেপ্তার করল এবং ২ বছর কারাদণ্ড হল হাওড়া কোর্টের বিচারে।

প্রেসিডেন্সী জেলে থাকার সময় সুভাষচন্দ্র, বিপিন বিহারী ইত্যাদি প্রথম শ্রেণীর নেতাদের সঙ্গে পরিচয়। দমদম জেলে বদলী হয়ে উলুবেড়িয়ার নান্টু ঘোষ এবং বাবা গুরুদিৎ সিং-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল। মুক্তির পর এই নেতাদের নির্দেশে চলার সংকল্প গ্রহণ করেন।

মুক্তির পর প্রধানত বিপিন গাঙ্গুলী মহাশয়ের নেতৃত্বে কাজ করে সালিখা ব্যায়াম সমিতি, মাকড়দহ ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হন। শরীর চর্চার ব্যবস্থা হল। এবার সালিখা বিদ্যাপীঠ স্থাপন করে জাতীয় ধারায় শিক্ষার ব্যবস্থা। তখন হাওড়া শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন ক্লাব, পাঠাগার ও ব্যায়ামাগারের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে প্রতিষ্ঠিত হল "হাওড়া

ফেডারেশন অফ এ্যাসোসিয়েশনস্।" বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে প্রবর্ত্তিত হল "নববর্ষ উৎসব।"

এই সময় গুপ্ত আন্দোলনে আত্মগোপনকারী কর্মীদের নিরাপদে রাখা এবং নূতন কর্মী সংগ্রহও করতে হত।

১৯৪২ সালের আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করেন।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ খাঁড়া (৩৫)

হাওড়া জেলার বাগনান থানার অন্তর্গত বাড়হাল্লান গ্রামের অধিবাসী ৺গোপাল চন্দ্র খাঁড়া মহাশয়ের পুত্র শ্রীনরেন্দ্র নাথ খাঁড়া (৬৪) একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। মুগকল্যাণ বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন শ্রীচণ্ডীদাস ঘোষ মহাশয়ের নেতৃত্বে গাঁজা, মদ, আফিঙ-এর দোকানে পিকেটিং করিয়া ১৯৩০ সালে গ্রেপ্তার হ'ন এবং ৬ মাস কারাজীবন যাপন করেন। অতঃপর ১৯৩২ সালে একই নেতৃত্বে গুলানন্দপুরে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়া সভা করিতে গেলে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইয়া ৩ মাস কারাবাস করেন। শ্রী খাঁড়া মহাশয় গান্ধীজীর নেতৃত্বে হরিজন আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বর্তমানে গান্ধীবাদে অটুট বিশ্বাস রাখিয়া বহু দুখে কষ্টের মধ্য দিয়া বেকার জীবনযাপন করিতেছেন।

শ্রীভূধর চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৩৬)

শ্রীভূধর চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৬৩), হাওড়া জেলার আমতা থানার অধীনস্থ খালনা গ্রামের ৺সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। যৌবনে তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে

নিজেকে যুক্ত করেন। তিনি ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৩২ সালে আমতায় ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া তিনি গ্রেপ্তার হন। উলুবেড়িয়া কোর্টে তাঁহার বিচার হয়, বিচারের পর ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। বন্দী অবস্থায় তিনি দমদম ও হিজলী জেলে ছিলেন। তিনি তাঁহার রাজনৈতিক জীবনে শ্রীচণ্ডীদাস ঘোষ প্রমুখ নেতাদের সংস্পর্শে আসেন। জেলে বন্দী থাকাকালীন শ্রীবিভূতি ভূষণ ঘোষ (নান্টু) এর সংস্পর্শে আসেন। গান্ধী ভক্ত শ্রী বন্দোপাধ্যায় বর্তমানে গ্রামে শিক্ষকতায় নিযুক্ত আছেন। স্বগ্রামে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্য্যের সংগে তিনি নিজেকে যুক্ত রাখিয়াছেন।

শ্রীচন্দ্রকান্ত কবিরাজ (৩৭)

শ্রীযুক্ত পরাণচন্দ্র কবিরাজের পুত্র চন্দ্রকান্ত মুগকল্যাণের নিকটবর্তী হরিনারায়ণপুরে জন্মগ্রহণ করেন ৬৩ বছর আগে।

ছাত্রজীবনে সমবয়সীদের সঙ্গে "তরুণ সমিতি" গঠন করে নানা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে বহু পুস্তক সংগ্রহ করে নিজেরা পড়েন এবং অন্যদের পড়াবার ব্যবস্থা করেন। গান্ধীজীর ডাকে তখন দেশের যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে সাড়া জেগেছে। তরুণ সমিতি এই সুযোগে একদল সংগ্রামী যুবক তৈরী করে চলেছে। ইংরাজকে তাড়িয়ে দেশকে স্বাধীন করার মন্ত্র সবার কাণে বেজে চলেছে। বাড়ীর লোককে লুকিয়ে নিষিদ্ধ পুস্তক ট্রাঙ্কে বোঝাই করে শোবার ঘরের মেঝে খুঁড়ে লুকিয়ে রেখেছেন। সরকার তরুণ সমিতিকে বে-আইনী ঘোষণা করলেন। বাড়ী থেকে পালিয়ে ২৪ পরগণার নীলাতে লবণ সত্যাগ্রহ করতে গেলেন নেতা বিপ্লবী হরিকুমার চক্রবর্তী। লাঠির আঘাতে অচৈতন্য অবস্থায় হাস-পাতালে। কয়েকদিন পরে খানিকটা সুস্থ হয়ে আবার সত্যাগ্রহে

যোগদান। ফলে গ্রেপ্তার ও ২ মাস কারাদণ্ড। জেল থেকে বেরিয়ে নিজ গ্রামে ফিরে এলেন। কয়েকদিন পরই বাগাণ্ডায় সত্যাগ্রহ করতে গিয়ে আবার গ্রেপ্তার। এবার জেল ৬ মাস। ১৯৩২ সালে ন্যন্টের হাটে রাজনৈতিক সম্মেলনের সম্পাদক হিসাবে আবার গ্রেপ্তার। পুলিশের অত্যাচারে জর্জরিত অবস্থায় হাজতবাস। তারপর ৭ মাস জেল। সংগ্রামী জীবনে চণ্ডীদাস ঘোষ, বিভূতি (নান্টু) ঘোষ, হেমন্ত বসু ইত্যাদি নেতার সাহচর্য এবং নির্দেশ-উপদেশ লাভের সৌভাগ্য হয়েছে।

শ্রীচুণীলাল দত্ত (৩৮)

রাজবল্লভ সাহা লেন হাওড়ার একটি বর্দ্ধিষ্ণু পল্লী। চুণীলাল দত্ত ৺উপেন্দ্র নাথ দত্তের পুত্র। ১৯১০ সালে জন্ম। ১৬ বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রীয় হন। ১৯৩০-৩১ সালে বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। ৬ মাসের সাজা ভোগ করতে প্রেসিডেন্সী জেলে পাঠান হয়। সেখানে জেল আইন ভাঙ্গার অপরাধে জেল ওয়ার্ডারদের প্রহারে সাংঘাতিক ভাবে আহত হন। তাঁর শ্রবণশক্তি লুপ্ত হয়। এখনও শরীরের নানা স্থানে সেদিনের অত্যাচারের দাগ আছে। কারাবাসের সময় একই জেলে ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, বিধান চন্দ্র রায়, শান্তি দাশগুপ্ত প্রভৃতি নেতাগণ। জেল বদল হয়ে দমদম জেল থেকে মুক্তি পান।

চিরকাল কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসী।

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্তী (৩৯)

যশস্বী চিকিৎসক এবং সঙ্গীতসাধক ৺হৃদয়কৃষ্ণ চক্রবর্তীর পুত্র শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্তী ১৯১০ সালে তাজনগর (পোঃ আমড়দহ) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

সিটি কলেজ আই, এস, সি পরীক্ষার বছরে ১৯৪০ সালে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন। ডাণ্ডি অভিযানের স্মরণীয় কাহিনী প্রদেশে প্রদেশে লবণ আইন অমান্য এবং আন্দোলনের গতি তীব্রতর করে। প্রকাশ্য স্থানে দাঁড়িয়ে জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয়ের দেশের ডাক পড়াও ইংরাজ আইনে 'অপরাধ। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলেই গ্রেপ্তার। মদ, গাঁজা, আফিঙ খাইয়ে দেশবাসীকে নিষ্ক্রীয় করে রাখার সরকারী চক্রান্তের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনের নেতা সক্রীয় আন্দোলনের ডাক দিলেন। পিকেটিং হল। গোড়ার দিকে পুলিশ সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার না করে মারধর করেই ছেড়ে দিত। কিন্তু তারপর আর ছাড়া হত না। এইরকম এক আন্দোলনে মনোরঞ্জন চক্রবর্তী গ্রেপ্তার হলেন। সাজা ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড।

পরবর্তী জীবনে চিকিৎসকের কাজের সঙ্গে নানা গঠনমূলক কাজ করে যাচ্ছেন।

শ্রীপুলিন চন্দ্র মান্না (৪০)

শ্রীপুলিন চন্দ্র মান্না (৬২) হাওড়া জেলার শুভরআড়া গ্রামের ৺হীরালাল মান্না মহাশয়ের পুত্র। যৌবনে তিনি ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেন। ১৯৩২ সালে কুলডাঙ্গা

বাজারে আফিঙ গাঁজার দোকানে পিকেটিং করিয়া গ্রেপ্তার হন। হাওড়া কোর্টে তাঁহার বিচার হয়। বিচারে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। বন্দী অবস্থায় তিনি আলিপুর, হিজলী জেলে ছিলেন। বর্তমানে আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হওয়া সত্বেও নিজেকে বিভিন্ন গঠনমূলক কার্যের সঙ্গে যুক্ত রাখিয়াছেন।

শ্রীকানাই লাল সামন্ত (৪১)

শ্রীকানাই লাল সামন্ত (৬২), হাওড়া জেলার বাগনান থানার অধীনে বাঁটুল গ্রামের অধিবাসী ৺কালিপদ সামন্তর পুত্র ম্যাটি-কুলেশন পরীক্ষার সময় নিজেকে ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনে যুক্ত করেন। ১৯৩০ সালে সারা ভারতবর্ষে গান্ধীজীর নেতৃত্বে যখন লবণ আন্দোলন আইন অমান্য আন্দোলন চলিতেছিল তিনি তখন সেই ডাকে সাড়া দিয়া মুগকল্যাণ ক্যাম্পে তাহার নিজের নাম লেখান। তাঁহার নিজস্ব বাটীর সন্নিকটে মদের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পিকেটিং করিবার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। শেষে খুন্টিয়ার গাঁজার দোকানে পিকেটিং করিয়া ছয়মাস কারাবরণ করেন। আজীবন গান্ধীবাদে বিশ্বাসী শ্রীসামন্ত বর্তমানে দারিদ্র্য ভারে ক্লিষ্ট একজন সাধারণ শ্রমজীবি হিসাবে জীবনযাপন করিতেছেন।

শ্রীরামচন্দ্র মুখার্জী (৪২)

১৯১০ সালে বাইনান গ্রামে জন্ম। ছাত্রাবস্থায় লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান। অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলনে ১৯৩০ সালে বিভূতি বাবুর নিকট বাগনান শিবিরে

শিক্ষালাভ। একদিন গভীর রাত্রিতে পুলিশ ক্যাম্প ঘেরাও করে সকল সত্যাগ্রহী কর্মীকে ধরে নিয়ে গেল। বিচারে ৩ মাসের জেল হল। অভাবের সংসারে নিরন্তর সংগ্রাম করেই চলেছেন।

শ্রীজ্ঞানোজ কুমার ঘোষ (৪৩)

১৯২৮ সালে কলিকাতার সন্নিহিত অঞ্চল হাওড়া থেকে বহু তরুণ স্বেচ্ছাসেবক পার্ক সার্কাসে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে কাজ করতে এসেছিল। সুভাষচন্দ্র ছিলেন সর্ব্বাধিনায়ক। তাঁর অনুপ্রেরণায় স্বেচ্ছাসেবকগণ সকলেই স্বাধীনতা সৈনিক হয়ে অধিবেশন শেষে গ্রামে গ্রামে ফিরে গেলেন। তাই ১৯৩০ সালে আন্দোলনের ডাকে এই সেনানীরাই প্রথমে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। বাগনান বিভূতি ঘোষের ক্যাম্প হয়ে উঠলো তীর্থক্ষেত্র, দলে দলে তরুণ, যুবক, বৃদ্ধ এগিয়ে এলেন সংগ্রামের জন্য। চন্দ্রপুর গ্রামের জ্ঞানোজও ঘরে বসে থাকতে পারলেন না। মদের দোকান, গাঁজার দোকান, বিলাতি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং, রাজনৈতিক সভা, প্রভাত ফেরী. লবণ আইন অমান্য আন্দোলন চলছে। দলে দলে কর্মীরা কারাবরণ করছে। আবার একদল তাদের স্থান দখল করছে। পিকেটিং করে প্রথম গ্রেপ্তার হলেন ১৯৩০ সালে। ৬ মাসের জেল হল। জেল থেকে বেরিয়ে শিবির বদল করে মুগকল্যাণ ক্যাম্পে চণ্ডীদাস বাবুর সঙ্গে যোগ দিলেন। সেখান থেকে পুলিশ আবার ধরে নিয়ে গেল এবং বিচারে আরও ৬ মাসের জেল হল।

শ্রীবিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (৪৪)

মাজু গ্রামে মাতুলালয়ে ১৩১৭ সালের ২৭শে শ্রাবণ ৺ইন্দ্র-নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র বিভূতিভূষণ জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকালে পিতৃবিয়োগের পর আত্মীয়গৃহে থেকেই শিক্ষালাভ করেন। ১৭ বছর বয়সে জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয়ের ম্যাজিক ল্যান্টার্ণ যোগে দেশেরডাকে বক্তৃতা শুনে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হন। তারপর হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শরৎচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায় এবং সম্পাদক হরেন্দ্র নাথ ঘোষের সঙ্গে পরিচিত হয়ে কংগ্রেস কর্মী হিসাবে কাজ আরম্ভ করেন।

১৯২৮ সালে বিপিন গাঙ্গুলী মহাশয়ের প্রচেষ্টায় গিরীন্দ্রনা বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসীচরণ সরকার ইত্যাদি ঢাকার অনুশীলন সমিতির আদর্শে একটি বিপ্লবী দল গড়ে তোলেন। সেই দলে যোগ দিলেন বিভূতি ভূযণ। তারও আগে মাজুতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে স্বেচ্ছা-সেবকের কাজ করেন।

১৯৩০ সালে মাজু বাজারে মদের দোকানে পিকেটিং করার সময় ধৃত হয়ে ৬ মাস কারাবরণ করেন। প্রেসিডেন্সী জেলে নির্জন সেলেও ডাণ্ডাবেড়ী সাজা হয়। দমদম জেল থেকে মুক্তির আগে গদর পার্টির নেতা বাবা গুরুদিৎ সিং সহ বহু খ্যাতনামা বিপ্লবী নায়কের সঙ্গে পরিচয় লাভ করেন।

পরবর্তীকালে স্থানীয় কংগ্রেসের সম্পাদক এবং ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্য হিসাবে দেশসেবার কাজ করেন।

শ্রীনয়নরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (৪৫)

৩।২, রামমোহন মুখার্জী লেন, শিবপুর অঞ্চলের ৺বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র নয়নরঞ্জন ১৯৩০ সালের অসহযোগ এবং বিলাতী বস্ত্র বিতরণ মাদকদ্রব্য বর্জন আন্দোলনের একজন সৈনিক। ১০ বছরের যুবক নয়নরঞ্জন প্রথম গেলেন লবণ আইন অমান্য করতে রূপনারায়ণ তীরে। ফিরে এসে কংগ্রেস অফিসে নেতা হরেন্দ্রনাথ ঘোষের সঙ্গে পরবর্তী কার্যক্রম ঠিক করছেন এমন সময় পুলিশ এসে দু'জনকেই ধরে নিয়ে গেল। তার আগে বিলাতী বস্ত্র বয়কট প্রচারে ২ দিন হাজত বাস হয়ে গেছে। এবার আদালত ৬ মাস কারাদণ্ডের আদেশ দিল। প্রেসিডেন্সী জেলে তখন বহু রাজনৈতিক বন্দী। নানা অব্যবস্থায় জন্য জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্য। পরিনামে লাঠিচার্জ। সেণ্ট্রাল জেলে বদলী। সেখানে ৫ দিন অনশন ধর্মঘটে যোগদান। দমদম স্পেশাল জেলে বদলী। সেখানে রাজনৈতিক বন্দীদের সুযোগ সুবিধা অনেক বেশী ছিল। পরবর্তীকালে নানা যুব সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ।

শ্রীসুফল চন্দ্র মান্না (৪৬)

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এমন অনেক রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীর কথা আমরা জানি। হাওড়া জেলার পাঁচলা থানার জুজারসাহা গ্রামের ৺হরিদাস মান্নার পুত্র সুফল চন্দ্রও রাজনৈতিক জীবনে ইস্তফা দিয়ে "মহাজন যেন গত সঃ পন্থা" অনুসরণ করে সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করেছেন। বর্তমান বয়স ৬১ বৎসর।

১৯৩১ সালে সত্যাগ্রহীরূপে জঙ্গারসাহাতেই গ্রেপ্তার হন এবং ৩ মাস কারাবাস করে ফিরে আসেন। হিজলী জেল থেকে ফিরেই শিবপুরে আবার গ্রেপ্তার এবং আরও ৩ মাস কারাদণ্ড। আবার হিজলী জেল। মুক্তির পর উলুবেড়িয়া শহরে জালিয়ান-ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের স্মরণ উৎসব করার সময় তৃতীয়বার গ্রেপ্তার হলেন। এবার ৬ মাস কারাদণ্ড। উলুবেড়িয়া জেল, আলীপুর সেণ্ট্রাল জেল এবং দমদম জেলের অভিজ্ঞতা হল। জেল দিয়ে কি মাকে—দেশ মাতৃকাকে ভোলানো যায়?

১৯৩৪ সালে তাই শ্যামপুর শশাটী গ্রামে আবার পুলিশ গ্রেপ্তার করল। ৬ মাস কারাদণ্ড। অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত হলে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ৪১ সালের আহ্বান এলো। পাঁচলা থানার গঙ্গাধরপুর গ্রাম থেকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। এবার আর বিচারের প্রহসন হল না। বিনা বিচারেই ৬ মাস দমদম জেলে সিকিউরিটি প্রিজনার।

এবার চললেন বাংলার বাইরে সুদূর পুনা শহরে সত্যাগ্রহী-রূপে। সেখানকার পুলিশ আটক বন্দী হিসাবে বিখ্যাত এড়োড়া জেলে বন্দী করে রাখলো। মুক্তি পাবার পর সর্বসময়ের জন্য কংগ্রেস কর্মীরূপেই কাজ করেছেন। ১৯৫২ সালে প্লুরিসি রোগে আক্রান্ত হয়ে ৺প্রিয়রঞ্জন সেন, ডাঃ বৃন্দাবন বসু, শ্রীসাধন চন্দ্র মিত্র ও শ্রীবিজয় কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের সাহায্যে চিকিৎসা চলে। তারপর কাঁচড়াপাড়া হাসপাতালে বছর খানেক চিকিৎসার পর নিজের কর্মকেন্দ্র হাঁটালে ফিরে আসেন। কিছুদিন পর সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করেছেন।

শ্রীতারাপদ মজুমদার (৪৭)

শ্রীতারাপদ মজুমদার (৬২) ১৯১০ সালে, আমতা থানার অধীনে, থলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ মজুমদার। শ্রীতারাপদ মজুমদার স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে ১৯৩২ সালে হাওড়া কোর্টে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়া হিজলী জেলে ছয়মাস কারাবরণ করেন। অতঃপর ১৯৩৩ সালে তাঁহাকে একই অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়া আলিপুর প্রেসিডেন্সী জেলে প্রেরণ করা হয়। এখানে তিনি পুনরায় ছয়মাস কারাবরণ করেন। জেল হইতে মুক্তি পাইবার পর, হাওড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করিবার অভিযোগে উলুবেড়িয়ায় তাঁহার বিচার হয় এবং একবৎসরের জন্য তাঁহাকে হিজলী জেলে বন্দী জীবনযাপন করিতে হয়। বিখ্যাত হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করিয়া এক বৎসর কারাবাসে জীবনযাপন করেন। শ্রীমজুমদার বর্ত্তমানে স্থানীয় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংস্থার কাজে নিজেকে যুক্ত রাখিয়াছেন।

শ্রীসুকেশ প্রসাদ হাজরা (৪৮)

২২৬/৪নং বেলিলিয়াস রোডের অধিবাসী শ্রীসুকেশ প্রসাদ হাজরা ৺চিন্তামণি হাজরার পুত্র। জন্ম—১৯১১ সাল। বাল্যকাল কলিকাতায়। গান্ধীজী ১৯২১ সালে কংগ্রেসের মধ্যে প্রথম যখন সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূচনা করেন তখনই বালক সুকেশ সেদিকে আকৃষ্ট হয়। ১৯৩২ সালে স্বেচ্ছাসেবকরূপে পুলিসের নির্যাতন ভোগ করেন। ১৯৩২ সালে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে

যোগদানের অপরাধে ইংরাজ সরকার কর্তৃক ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। মুক্তির পর আবার আন্দোলনে যোগ দিয়ে ১৯৩৩ সালে আবার পুলিশের লাঠি চালনায় গুরুতররূপে আহত হন। ১৯৪২ আন্দোলনে শিবপুর থানা দখল অভিযানে গ্রেপ্তার ৯ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন।

শ্রীনবনী কুমার চক্রবর্তী (৪৯)

আমতার ৺ভানুচরণ চক্রবর্তীর পুত্র নবনীকুমার।

১৯৩০ সালে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং মাদকদ্রব্য বর্জ্জন আন্দোলনে পিকেটিং করার সময় গ্রেপ্তার হন ১৯৩০ সালের আগষ্ট মাসে। ১৯৩১ সালে জানুয়ারী মাসে মুক্তির পর আবার আন্দোলনে যোগদান এবং আবার গ্রেপ্তার মার্চ মাসে। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে থাকার সময় পুলিশি অত্যাচারে জর্জ্জরিত। জেল হাসপাতালে চিকিৎসার পর ডাণ্ডা-বেড়ী। তারপর দমদম স্পেশাল জেলে বদলী।

দুই দফায় মোট এক বছর কারাবাস।

বর্তমানে ৭/২, তাঁতিপাড়া লেন, হাওড়া ৪ ঠিকানায় বসবাস করেন।

শ্রীহেমন্ত কুমার দে (৫০)

হাওড়া মোটর কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত ব্যবসায়ী এবং দানবীর ৺অতীন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের পুত্র শ্রীহেমন্ত কুমার দে। বর্তমান বয়স ৬০ বছর।

১৯২৮ সালে বিবেকানন্দ স্কুলের ছাত্র। প্রিয় শিক্ষক শ্রীবিপিন বসু সত্যাগ্রহ করে গ্রেপ্তার হলেন। ছাত্রদের মনে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানের প্রেরণা সঞ্চার হল। মেধাবী ছাত্র শুভানুধ্যায়ীদের নিষেধ অগ্রাহ্য করে এ. বি, এস, এ ছাত্র সংগঠনে যোগ দিলেন শ্রীকৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। বেলিলিয়াস পার্কের মধ্যে শিবির। সেখান থেকেই মদের দোকানে পিকেটিং চালালো, সভার আয়োজন করা গোপনীয় ইস্তাহার প্রকাশ চলছে। হেমন্তর উপর দায়ীত্ব ভিক্ষা করে অর্থ সংগ্রহ করে স্বেচ্ছা-সেবকদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা, ছাপাখানা থেকে ইস্তাহার ছাপিয়ে বিলি করা ইত্যাদি। শহরের পাশে কোণা গ্রাম থেকে প্রত্যহ মার্টিন রেলে হাওড়া যাতায়াত। পিকেটিং করার সময় লাঠি পুলিশ অনেক সময় লাঠি চালিয়ে প্রচণ্ড মারধর করছে। জেল ভর্তি হয়ে গেছে তাই আর গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। ৺অভয় বন্দোপাধ্যায়, সুজন সরকার, সুহৃৎ বিশ্বাস তখন ছিলেন প্রথম সারির কর্মী। সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বন্ধু ৺বৃন্দাবন বসুর মাধ্যমে এদের সঙ্গে যোগাযোগ। তারপর হাওড়া টাউন হলে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয়ের পর সংগ্রামী চেতনা আরও বাড়লো। এ, বি, এস, এ হাওড়া জেলার যুগ্ম-সম্পাদক হলেন হেমন্ত। 'ভাবিকাল' পত্রিকা প্রকাশ করতেই সরকার বাজেয়াপ্ত করলো। স্বেচ্ছাসেবক দল নিয়ে পিকেটিং করতে যাবার সময় কদমতলা ষ্টেশনে পুলিশ নির্যাতন করার পর গ্রেপ্তার করলো। বিচারে জরিমানা / জেল হল। ৺বঙ্কিম কর জরিমানার টাকা দিয়ে দিলেন।

সেবার নেতারা কারাগারে। পুলিশ কংগ্রেস অধিবেশন করতে দেবে না। এ, বি, এস, এ দায়ীত্ব নিল। কলকাতার সব পার্ক পুলিশ দখল করেছে। উত্তর পাড়ার বিপ্লবী নেতা রোগ শয্যায় শায়িত ৺অমর চট্টোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করতে রাজী হয়ে বললেন চিড়িয়াখানার মধ্যেকার মাঠেই কংগ্রেস অধিবেশন

কর। হেমন্ত এবং বন্ধুরা আয়োজন করছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তার নেতৃত্বে এসপ্ল্যানেড ট্রাম ডিপোর মধ্যেই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত সকলকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করলো। এবার বিপ্লবীদলের সংস্পর্শে এলেন। ঘণ্টুদা, ডাঃ আলী ইমাম, ৺বৃন্দাবন বসু, দানু বসু, সুনীল দাস ইত্যাদি বন্ধুরা অসম সাহসের সঙ্গে, সব কিছু ত্যাগ করে, ভবিষ্যতের চিন্তা বিসর্জন দিয়ে বন্দেমাতরম মন্ত্র সম্বল করে দেশমাতৃকার সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। নানুদা (শ্রীবিভূতি ভূষণ ঘোষ) সর্বসময় হেমন্তকুমারকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছেন। স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই যুব সংগঠনে এবং জেলা ও রাজ্য ক্রীড়া সংস্থা সমূহের সঙ্গে কার্যকরীভাবে যুক্ত আছেন।

শ্রীবনমালী ঘোষ (৫১)

মহিষরেখার কাছে শ্রীকৃষ্ণপুর। ৺ধরণীধর ঘোষের পুত্র বনমালী। অনেক আন্দোলনের সৈনিক বনমালী ৩ বারে মোট ২ বছর ৮ মাস জেল খেটেছেন। তারপর গঠনমূলক কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। মহাত্মাজীর আহ্বানে হিন্দু - মুসলমান সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার কাজে নোয়াখালীতে ২ বছর কাজ করেছেন। শ্রীচারু ভাণ্ডারীর নেতৃত্বে নকসালবাড়ীতে শান্তি ফিরিয়ে আনার কাজেও গেছেন। সংসারী না হয়ে সর্বোদয়কেই জীবনের লক্ষ বলে গ্রহণ করেছেন। ১৯৩০ সালে গাঁজার দোকানে পিকেটিং করে ৬ মাস জেল। দ্বিতীয়বার ১৯৩২ সালে সত্যাগ্রহ করায় ২ মাস এবং শেষবার ১৯৪২ সালে "ভারত ছাড়" আন্দোলনে ২ বছর কারাদণ্ড হয়।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ রায় (৫২)

৺প্রসন্নকুমার রায় এর পুত্র শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ রায় ১৯১১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই, স্বদেশী আন্দোলনের ডাকে সাড়া দেন। ১৯২৬ সালে কার্জন পার্কে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর সভায় পুলিশ কর্তৃক প্রহৃত হন। ১৯৩২ সালেও নির্যাতন ভোগ করেন।

প্রথমবার গ্রেপ্তার ১৯৩২ সালে এবং কারাবাস ৯ মাস। দ্বিতীয়বার "ভারত ছাড়" আন্দোলনে ১৯৪২ সালে হাওড়া সন্ধ্যা-বাজারের নিকট গ্রেপ্তার হয়ে আরও ৯ মাস কারাবরণ করেন।

শ্রীমুরারী মোহন মণ্ডল (৫৩)

জয়পুর ফকিরদাস বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাণে বাগনান স্বেচ্ছাসেবক ক্যাম্পের আহ্বান এসে পৌঁচেছে ১৯৩০ সালে। মুরারীমোহন কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ট্রেনিং নেবার জন্য বাঙ্গালপুর ক্যাম্পে হাজির হলেন। মাসখানেক শিক্ষালাভ করে গ্রামে ফিরে এলেন স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ নিয়ে। বাড়ীর লোকজন, পাড়া - প্রতিবেশী নিষেধ করলেন—"আন্দোলনে যোগ দিয়ে ভবিষ্যৎ নষ্ট করো না। তোমার বাবা তিনকড়ি মণ্ডল বি, এন, রেলে কাজ করেন। তুমি স্বদেশী করলে তাঁর চাকুরী যাবে।" কিন্তু তখন কোন পিছুটান আর রাখতে পারে কি? একরাত্রে কয়েকজন বন্ধু নৌকাযোগে গৃহত্যাগ করে বাকসী হাটে উপস্থিত হলেন পূর্ব্ব পরিকল্পনামত পিকেটিং করার জন্য। চারজন করে একটি করে দল যাচ্ছে আর পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করছে।

অন্যরা তখন নৌকায় অপেক্ষমান। দ্বিতীয় দলে মুরারীমোহন গ্রেপ্তার হলেন। দীর্ঘ পথ হাটিয়ে পুলিশ বাগনান থানায় নিয়ে গেল। বিচারে ৬ মাস জেল। প্রেসিডেন্সী জেল থেকে ২ মাস পর বহরমপুর জেলে বদলী। কারামুক্তির পর আবার জয়পুরে ভর্তি হলেন। কিছুদিনের মধ্যেই উলুবেড়িয়ার মহকুমা শাসক স্কুল পরিদর্শনে এসে মুরারীমোহন তাঁর হাতে নিষিদ্ধ বুলেটিন দেন এবং কয়েকজন সহপাঠি কালো পতাকা দেখান। এই অপরাধে কয়েকদিন পর জয়পুর বাজারে সম্পাদক হেমেন্দ্র কুমার মণ্ডল এবং মৃগাঙ্ক কাঁড়ার সহ গ্রেপ্তার হন। বিচারে ৩ মাস কারাদণ্ড হল। প্রথমে আলীপুর এবং পরে দমদম জেলে থাকতে হয়।

শ্রীসুশীল কুমার ব্যানার্জী (৫৪)

৺সতীশ চন্দ্র ব্যানার্জীর পুত্র সুশীল কুমার গোপী চোংদার লেনের বাড়ীতে ১৯১৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

১৯৩০ সালে শিবগঞ্জ ক্যাম্প থেকে লবণ আইন অমান্য করে করে প্রথম ৩ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। মুক্তি পাবার পর আবার কংগ্রেস কর্মী হিসাবে কাজ করার সময় নিষিদ্ধ ইস্তাহর বিলি করার অভিযোগে গ্রেফতার। একবছর জেল হল ১৯৩১ সালে। হিজলী এবং মেদিনীপুর জেল থেকে বেরিয়ে আসার পরই আবার বে-আইনী জনসভা করার অভিযোগে তৃতীয়বার ৬ মাসের কারাদণ্ড। এবার প্রেসিডেন্সী জেল।

কয়েকবার জেলের অভিজ্ঞতায় বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে সংগ্রামের নূতন পথের সন্ধান পেয়ে কাজ করে চলেছেন। কিন্তু শীঘ্রই (১৯৩৪) সালে রিভালবর এবং তাজা কার্তুজসহ ধরা পড়ে গেলেন। এবার আর ছোট-খাটো ব্যাপার নয়। অস্ত্র

আইনে দ্বীপান্তর আদেশ সহ ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। ১৯৩৫ সালে আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠিয়ে দিল। অবশ্য বিচার চলার সময় ৬ মাস প্রেসিডেন্সী জেলেই বিচারাধীন বন্দী হিসাবে থাকতে হয়।

১৯৩৮ সালে অন্য আরও রাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে দমদম সেণ্ট্রাল জেলে ফিরিয়ে আনা হয় আন্দামান বন্দীদের দীর্ঘ অনশনের চাপে। জেল থেকে মুক্তির পর স্বগৃহে অন্তরীণ ৬ মাস থাকার পর মুক্তি।

রাজনৈতিক জীবনের পর নানা সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বর্তমানকাল পর্য্যন্ত কাজ করে যাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের আন্দামান বন্দী পেন্সন পাচ্ছেন।

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকমল সরকার (৫৫)

শ্রীকৃষ্ণকমল সরকার (৬০) ৫নং কালাচাঁদ নন্দী লেনের ৺মতিলাল মহাশয়ের পুত্র। শ্রীসরকার যৌবনের প্রারম্ভে বিপ্লবী পুলিন রায়ের সংস্পর্শে আসিয়া নিজেকে ভারতের মুক্তি আন্দোলনে যুক্ত করেন। তিনি ১৯৩০ সালে গান্ধীর ডাকে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া কারাবরণ করেন। এবং এই অভিযোগে তিনি তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩২ সালে পুলিশ পুনরায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন এবং ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আলিপুরে জেলে থাকাকালীন পুলিশ পাগলা ঘন্টি বাজিয়ে অন্যান্য বন্দীদের সহিত শ্রীসরকারের উপর অকথ্য অত্যাচার করেন। জেল হইতে মুক্তি পাইবার পর তিনি বেঙ্গল মেডিকেল ইনষ্টিটিউশন হইতে ডাক্তারী পাশ করেন। চিকিৎসা ব্যবসা ছাড়াও বর্তমানে তিনি বিভিন্ন সেবামূলক কার্য্যের সহিত যুক্ত আছেন। জেলে থাকাকালীন তিনি শ্রীবিভূতি ঘোষের (নান্টু) সাহচর্য্য লাভ করেন।

শ্রীবিষ্ণুপদ ধাড়া (৫৬)

শ্রীবিষ্ণুপদ ধাড়া (৬০) বাগনান থানার অধীনে কটাই গ্রামের অধিবাসী ৺ফকির চন্দ্র ধাড়া মহাশয়ের পুত্র শৈশবে মাতৃহারা হন। স্বর্গীয় দেশসেবক পূর্ণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ডাকে সাড়া দিয়া তিনি নিজেকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে যুক্ত করেন। তাঁহারই নির্দেশে হাওড়া জেলার বাগনান থানা ও আমতা থানার বহু জায়গায় বিভিন্ন ক্যাম্পে তিনি কাটান। বিভিন্ন স্থানে পিকেটিং, বিলাতী দ্রব্য বর্জন, পতাকা উত্তোলনে প্রভৃতি কার্য্যে নিজেকে যুক্ত করিয়া পুলিশী অত্যাচার ভোগ করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে গ্রেপ্তার হন এবং ছয়মাস কারবাস করেন। শ্রীধাড়া তাঁহার রাজনৈতিক জীবনে শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন, শ্রীচণ্ডীদাস ঘোষ প্রমুখ রাজনৈতিক নেতাদের সংস্পর্শে আসেন। আজীবন গান্ধীবাদে বিশ্বাসী হইয়া তিনি বর্তমানে স্থানীয় বিভিন্ন সেবামূলক কার্য্যে যুক্ত আছেন।

শ্রীগোষ্টবিহারী বসু (৫৭)

শ্রীগোষ্টবিহারী বসু (৬০) উলুবেড়িয়া থানা কুলগাছিয়া গ্রাম ৺সীতারাম বসু মহাশয়ের পুত্র। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন সক্রিয় একনিষ্ঠ কর্মী। ছাত্রাবস্থায় ১৯৩০ সালে অধ্যাপক বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে শিবগঞ্জে যে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয় তারই প্রভাবে তিনি তাঁহার বিদ্যালয়ের লেখাপড়া ছাড়িয়া বাগনানে বিভূতি ঘোষের (নান্টু) নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক হইয়া প্রথমবার জেলে যান (১৯৩০)। এই সময় তিনি ছয়মাস

কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৩২ সালে ধূলোগড়িতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বন্দী হন এবং ছয়মাসের জন্য কারাবরণ করেন। অতঃপর শিবপুর ক্যাম্পে আশ্রয় লইবারকালীন পুলিশ ক্যাম্প ঘেরাও করিয়া নেতা গুরুদাস দত্তের সহিত তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করেন। এই সময় দুইমাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। শ্রদ্ধেয় সতীশ দাশগুপ্তের আশ্রমে সোদপুরে কিছুদিন তালিম লইয়া শ্রীচণ্ডীদাস ঘোষের নির্দেশে শ্রীকৃষ্ণপুর হরিজন বিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বর্তমানে শ্রীবসু বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কার্যে যুক্ত আছেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র হাজরা (৫৮)

পিতা ৺পূর্ণচন্দ্র হাজরা, নিবাস পাঁচলা থানার জুজ্জারগ্রামে। বর্তমান বয়স ৬০ বৎসর। সমগ্র গ্রাম যখন স্বদেশী আন্দোলনে সামিল তখন যুবক সতীশচন্দ্রও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। পরিণামে ১৯৩২ সালে গ্রেপ্তার এবং ৬ মাস কারাদণ্ড।

শ্রীদুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায় (৫৯)

দুর্গাপদ চট্টোরাধ্যায় (৬০), হাওড়া জেলার জুজ্জারসাহা গ্রাম নিবাসী ৺লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র, তাঁহার ছাত্রবস্থা হইতেই স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেন। ১৯২৭ সালে মাজুতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৩০ সালে উত্তরপাড়ায় বিপ্লবী নেতা অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া কারাবরণ করেন। কলিকাতায় জোড়াবাগানে কংগ্রেস

কমিটির পরিচালনায় বিদেশী বস্ত্র বর্জন আন্দোলনে যোগদান করিবার অভিযোগে প্রেসিডেন্সী জেলে হাজত বাস করেন। ১৯৩২ সালে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং এই অভিযোগে তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হয়। কারাবাসকালেই তিনি গ্রাজুয়েট হন এবং আইন অধ্যায়ন এবং ঐ বিষয়ে পাশ করেন। ১৯৪৬ সালে প্রদেশ কংগ্রেসের সহঃ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি মোট সাড়ে চারিবৎসর কারাবাস করেন। বর্তমানে শ্রদ্ধেয় চারুচন্দ্র ভাণ্ডারীর সহিত সর্বোদয় আন্দোলনে কর্মরত এবং হাওড়ায় এ্যাডভোকেট।

শ্রীপরেশ চন্দ্র পাত্র (৬০)

পাঁচলা থানার জুজারসাহা গ্রামে পরেশ চন্দ্রের জন্ম ১৯১২ সাল। পিতা ৺সাধন চন্দ্র পাত্র।

বাল্যকালে লেখাপড়া ত্যাগ করে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন ১৯৩২ সালের ৯ই জানুয়ারী। ধরা পড়েন এবং পুলিশের নির্য্যাতন ভোগ করেন। বিচারে ৬ মাস কারাদণ্ড। দমদম স্পেশাল জেলে কারাবাস করতে হয়।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মাজী (৬১)

মুগকল্যাণ সাহড়া গ্রামের ৺রাখাল চন্দ্র মাজীর পুত্র শ্রীফণীন্দ্র নাথ মাজীর বয়স এখন ৬০ বৎসর। দরিদ্র পরিবারের সন্তানের কাণেও স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক পৌঁছে গেল। গ্রামেই রয়েছেন আদর্শবাদী সংগঠক চণ্ডীদাস ঘোষ। তাঁরই আহ্বানে ঘর ছেড়ে ক্যাম্পে যোগদান।

১৯৩০ সালে গ্রেপ্তার এবং ৬ মাস কারাদণ্ড ১৯৩১ সালে ৪ মাস এবং ১৯৩২ সালে আরও ৪ মাস। মোট ১ বৎসর ২ মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। প্রেসিডেন্সী জেল এবং দমদম এ্যাডিশনাল জেলে কারাবাস।

সেখ আব্দুল মুজিদ ওরফে মুজিবর (৬২)

হাওড়া জেলার যে কয়েকটি গ্রামের নাম ১৯৩০-৩১ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে ওঠে তার মধ্যে একটি ছিল জুজারসাহা। এই গ্রামে নেতৃত্ব দেবার মত কর্মী ছিলেন বলেই দলে দলে কর্মী এগিয়ে এসেছিলেন। তখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যুবকগণ সাধারণত কংগ্রেসের কাছে পিঠে আসতেন না। কিন্তু আব্দুল মুজিদ সংগ্রামের পথই বেছে নিল। টেলারিং দোকান করে জীবিকা নির্বাহ করতে করতেই বৃহত্তর কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দিয়ে অন্য কর্মীদের দলে মিশে গেল। কুলডাঙ্গা বাজার থেকে একদল পিকেটিংরত কর্মীর সঙ্গে ধৃত হল। তারপর ৬ মাস জেল খেটে গ্রামে ফিরে এলো। কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হল না। বর্তমান বয়স ৬০ বৎসর।

শ্রীজীতেন্দ্র নাথ পাত্র (৬৩)

জুজারসাহা গ্রামের ৺ত্রিধকুমার পাত্র মহাশয়ের পুত্র জীতেন্দ্র নাথের বর্তমান বয়স ৬০ বৎসর। আজ থেকে ৪০ বছর আগে-কার স্বদেশী আন্দোলনের যে জোয়ার সারা ভারতবর্ষকে প্লাবিত করেছিল তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারও ছিল না। কয়েক শ্রেণীর খয়ের খা পরিবার ছাড়া সকল পরিবারের তরুণ যুবকের দলই সেই আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেয়। জীতেন্দ্র নাথও

সভা-শোভাযাত্রায়, তকলী ও চরকা কাটায়, পিকেটিং-এ যোগ দিলেন। পুলিশের হাতে ধরা পড়তেও দেরী হল না।

১৯৩২ সালে পিকেটিং করার সময় গ্রেপ্তার এবং পুলিশের নির্যাতনের পর আদালতে বিচার। ৬ মাস জেল হল। ১৫ দিন প্রেসিডেন্সী জেল এবং বাদ বাকী সময় দমদম স্পেশাল জেলে কাটলো। ফিরে এসে নানা গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

শ্রীঅরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায় (৬৪)

শ্রীঅরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৩০ সালে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকরূপে কংগ্রেসে যোগ দেন। পরিশ্রমী সংগঠক অরুণ কুমার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে নিয়ে শিবপুর তরুণ সমিতি প্রতিষ্ঠা করে যুব আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৩৯ সালে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। জেলা কৃষক সমিতির সভাপতি-মণ্ডলীর সদস্য, মহকুমা কংগ্রেস কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক এবং ৮নং ওয়ার্ড কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন। বিভিন্ন সময় পুলিশ বাড়ী সার্চ করেছে। গোয়েন্দা অফিসে নিয়ে গিয়ে নানা জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার সময় ইংরাজ সরকার দুইবার স্বগৃহে মোট ৯ মাস গৃহবন্দী করে রাখে।

পরবর্তীকালে হাওড়া জেলায় কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রতিষ্ঠায় বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন।

শ্রীমহাদেব পাত্র (৬৫)

পাঁচলা থানার গোল্ডল পাড়া গ্রামে ১৯১২ সালে জন্ম ; পিতা ৺ভূতনাথ পাত্র। ১৯৩২ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান

করে নানাস্থানে আবগারী দোকানে পিকেটিং করেন এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেন।

১৯৩৯ সালে সত্যাগ্রহী হিসাবে পদব্রজে বিহার পর্য্যন্ত যান। সঙ্গী ছিলেন শ্রীদুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়। ১৯৪২ সালে গঙ্গাধরপুর গ্রামে গ্রেপ্তার হয়ে সিকিউরিটি বন্দীরূপে প্রেসিডেন্সী এবং দমদম জেলে ৬ মাস কারাবাস করেন। ১৯৪৩ সালে কার্জন পার্কে গ্রেপ্তার হয়ে ৬ সপ্তাহ বিনা বিচারে এবং ৬ সপ্তাহ কারাদণ্ড ভোগ করেন। মুক্তির পর জেল গেটে একমাস স্বগৃহে অন্তরীণের আদেশ দেওয়া হয়। এই আদেশ ভঙ্গ করার জন্য হাওড়া কোর্টে মামলায় ৭ দিনের জেল হল।

সর্বমোট প্রায় ৯ মাস কারাবাস করতে হয়। পরবর্তীকালে নানাপ্রকার সমাজসেবার কাজে নিযুক্ত আছেন।

শ্রীসতীশ চন্দ্র পট্টনায়ক (৬৬)

পিতা ৺শরৎ চন্দ্র পট্টনায়ক ছিলেন উদং গ্রামের অধিবাসী। পুত্র সতীশ চন্দ্র নিজ গ্রাম থেকেই ১৯৩০ সাল অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। নিষিদ্ধ ইস্তাহার, বুলেটিন এবং দেশাত্মবোধক সংবাদপত্র সংগ্রামীদের হাতে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করে সারা জেলা সাইকেল যোগে অনবরত ঘুরে বেড়াতে হত। ১৯৩০ সালে হাওড়া শহরে সরকার কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত লিবার্টি এবং বঙ্গবাণী নিয়ে আসার সময় গ্রেপ্তার হন। সাইকেল বাজেয়াপ্ত হল এবং ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করার জন্য জেলে যেতে হল। আরও কয়েকবার গ্রেপ্তার এবং কারাবাস এবং পুলিশের নির্যাতন কপালে জোটে। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সালের অধিকাংশ সময় প্রায় চার বছর জেলেই কেটে যায়।

ফোরকান আলী খাঁ (৬৭)

১৯৩৭ সালে বিদেশী পরিচালিত লাডলো এবং গগলভাই জুট মিলের শ্রমিদের সংগঠিত করে যে বিরাট শ্রমিক আন্দোলন হয় তাতে যোগদান করেন। ধর্মঘটী বলে বাজারে গ্রেপ্তার করে এবং কোর্টে চালান দেয়। উলুবেড়িয়া কোর্ট জামীন দিতে রাজী হলেও জামিনদার না থাকায় জেলেই থাকতে হয়। বিচারে ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কারাগারে নানাপ্রকার অত্যাচার সহ্য করতে হয়।

শ্রীবিভূতি ভূষণ ব্যানার্জী (৬৮)

ছেলের মতিগতি ভাল ঠেকছে না। লেখাপড়ায় মন নেই। চণ্ডীদাসের কথায় মেতে উঠেছে। স্বদেশী আন্দোলনে কাজ করবে। পিতা ৺মণিলাল ব্যানার্জী কানাইপুর গ্রাম থেকে পুত্র বিভূতিকে নিরাপদ স্থান মজফঃরপুরে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু স্থান বদল হলেই তো মন বদল করা যায় না। মদ-গাঁজা-বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করে ইতিমধ্যেই হাতেখড়ি হয়ে গেছে। দেশকে স্বাধীন করার জন্য সব কিছু বিসর্জন দেবার সংকল্প তখন দৃঢ়বদ্ধ। মজফঃরপুর তো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তীর্থস্থান। পূর্ণোদ্যমে সেখানেই কাজে লেগে গেলেন। ১৯৪০ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী পুলিশ গ্রেপ্তার করলো। বিচারের প্রহসন শেষে কারাগারে আবদ্ধ করে রাখলো। ৬ বছর ৪ দিন পর ১৯৪৭ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী মুক্ত হলেন।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ খাঁড়া (৬৯)

বাগনান থানার পালোড়া (পোঃ বৈদ্যনাথপুর) গ্রামে ৺নিবারণ চন্দ্র খাঁড়ার পুত্র নরেন্দ্র নাথের জন্ম ১৯১৩ সালে। পানিত্রাস বিদ্যালয়ের ছাত্ররা পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে হরতাল এবং শোভাযাত্রা করে পুলিশের হাতে বেদম প্রহার খায়। পুলিশের লাঠি নরেন্দ্রনাথকে গৃহত্যাগ করে স্বেচ্ছা-সেবকে পরিণত করে। প্রথমে কলিকাতায় কালীঘাট কংগ্রেস এবং পরে মধ্য কলিকাতা কংগ্রেসে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নানা আইন অমান্য এবং পিকেটিং কাজে যোগ দেন। পুলিশের লাঠির আঘাতে একবার মাথা ফেটে যায়।

জেল খেটেছেন ১৯৩০ সালে ১ মাস এবং ৫ মাস। ১৯৩১ সালে ১ মাস এবং ৪ মাস। মোট ১১ মাস।

তারপর দীর্ঘদিন ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত থাকার পর সংগঠন কর্মী হিসাবে দেশ সেবা করেছেন।

শ্রীউমাকান্ত বেরা (৭০)

পিতা ৺কেদার নাথ বেরা, গ্রামঃ হরিনারায়ণপুর, পোঃ মুগকল্যাণ, বাগনান, হাওড়া। প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনে আকৃষ্ট হয়ে গোপনে গৃহত্যাগ করে সত্যাগ্রহী শিবিরে যোগদান। নেতা চণ্ডীদাস ঘোষ মহাশয়ের নির্দেশে একদিকে জাতীয়তার মন্ত্রে শিক্ষালাভ এবং অন্যদিকে নানা আন্দোলনে অংশগ্রহণ। কিছুদিনের মধ্যেই পুলিশ গ্রেপ্তার করলো এবং বিচারে ৫ মাস কারাদণ্ড হল (১৯৩০)। মুক্তির পর

আবার নিয়মিতভাবে স্বাদশী আন্দোলনের কর্মী। জেলের অভিজ্ঞতা পুলিশের শ্যেন দৃষ্টি বাঁচিয়ে প্রায় ২ বছর কাজ করার পর ১৯৩২ সালে আবার গ্রেপ্তার। এবার জেল হল ৬ মাস। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত সকল আন্দোলনে অংশগ্রহণ। বর্তমান বয়স ৪৯ বছর।

শ্রীজীতেন্দ্র নাথ দত্ত (৭১)

৺বিপিন বিহারী দত্ত মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র শ্রীজীতেন্দ্র নাথ দত্ত ১৭ বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার পরই স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন ১৯৩০ সালে। বাক্সী হাটে গাঁজার দোকানে পিকেটিং করার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং ৩ মাস জেল হয়। জেল থেকে বেরিয়ে জেলা কংগ্রেস নেতা হরেন্দ্রনাথ ঘোষের নেতৃত্বে সক্রীয় কর্মী হিসাবে কাজ করতে থাকেন। হাওড়া জেলা কৃষক আন্দোলনে যোগ দেন। এই আন্দোলনের স্থানীয় নেতা ছিলেন পূর্ণচন্দ্র কিন্তু সুভাষচন্দ্র এবং হরেনবাবুর নির্দেশেই কাজ হত।

১৯৩২ সালে বাগনান কনফারেন্স উপলক্ষ্যে আবার গ্রেপ্তার। বিচারে ৯ মাস কারাদণ্ড। জেলের মধ্যে শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন। ৺কার্ত্তিক চন্দ্র দত্ত, শ্রীঅরুণ ব্যানার্জি ও শ্রীগুরুদাস দত্ত ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় হল হিজলী জেলে। জেলারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অনশন ধর্মঘটে যোগ দেন। তারপর বদলী করে মেদিনীপুর জেলে।

শ্রীসুধীর চন্দ্র মাজী (৭১)

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে শেষ সংগ্রাম কংগ্রেসে "ভারত ছাড়" আন্দোলনের সৈনিক শ্রীসুধীর চন্দ্র মাজী জুজারসাহা অমূল্য বিদ্যা-মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পিতার নাম ৺গোষ্ঠবিহারী মাজী।

পুলিশ যখন বিদ্যামন্দির নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তালাবন্ধ করে দিয়ে যায় তখন সুধীরকেও ধরে নিয়ে গেল। বিচারে ৬ মাস জেল। বর্তমান বয়স ৪৮ বছর।

শ্রীঅবধূত মান্না (৭৩)

১৯৪২ সাল। "ইংরাজ তুমি ভারত ছাড়"। "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে" মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বেরিয়ে পড়লো দিলদা গ্রামের নবম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীঅবধূত মান্না। পিতা ৺পূর্ণচন্দ্র মান্না। ইংরাজ সরকারের পোষ্ট অফিস এবং থানা দখল করতে হইবে। প্রাকাশ্যে এগিয়ে গেলেই প্রহরীর গুলিতে নিশ্চিত মৃত্যু। রাতের অন্ধকারে কাজ চলছে। কিন্তু একদিন পথেই গ্রেপ্তার হলেন। বিচারে ৯ মাসের জেল। মুক্তির পর গ্রামে ফিরে দেখেন আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেছে। আর পড়াশোনা হল না। দেশমাতৃকার আহ্বান জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষায় শিক্ষিত করেছে। বর্তমান বয়স ৪৮ বছর।

শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় (৭৪)

শিবপুরের ১/১, রামচন্দ্র চ্যাটার্জী লেনের ৺ফণীভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র ভোলানাথের জন্ম ১৯১৩ সালে। ১৯৩০ সালে

হাওড়া ময়দানের সভায় অহিংস আইন অমান্য এবং অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম দলের স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভটাচার্যের সঙ্গে শ্যামপুরের শিবগঞ্জে আইন ভঙ্গ করেন। প্রথম গ্রেপ্তার বিলাতি বস্ত্র বর্জন সম্পর্কে হাওড়া হাটে পিকেটিং করার সময়। একদিন হাজত বাসের পর মুক্তি। ৺হরেন্দ্র নাথ ঘোষের নেতৃত্বে শিবপুর মদের দোকানে পিকেটিং করার সময় পুলিশের নির্যাতন এবং গ্রেপ্তার। বিচারে ৬ মাস কারাদণ্ড। প্রথমে প্রেসিডেন্সী জেল এবং পরে দমদম। তখন টেগার্ট সাহেব ছিলেন পুলিশের বড় সাহেব। তিনি একদিন সদলে জেলের মধ্যে ঢুকে আমাদের উপর নির্যাতন করেন।

শ্রীপ্রবোধ কুমার দাস (৭৫)

আমড়দহর নিকটবর্তী নাওদা গ্রামের ছেলে প্রবোধ কুমার মুগকল্যাণ বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণীর ছাত্র। পিতা ৺রসিক লাল দাস। জন্ম ১৯১৪ সাল। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ ১৯৩০ সালে সব স্কুলকে বিকল করে দিয়েছে শিক্ষক, ছাত্র, গ্রামবাসী সবাই গান্ধীজীর ডাকে স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল হতে চায়। জেলে যাওয়া তখন গৌরবের বিষয়। সকলে ধন্য ধন্য করে। মালা পরিয়ে বিদায় দেয় দেশের মুক্তি আন্দোলনের সৈনিকদের। ঝাঁপিয়ে পড়লেন আন্দোলনে ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুন্টের হাটে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। বিচারে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড। জেল থেকে ফিরে এসে বনমালী জানার নেতৃত্বে শ্যামপুরে কাজ শুরু।

১৯৩৩ সাল পর্যন্ত হরিজন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে অশিক্ষিত, দরিদ্র হরিজনদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন এবং শিক্ষকতা। এখনও সমাজ সেবার কাজে আগ্রহী কর্মী।

শ্রীবিমল কৃষ্ণ পাল (৭৬)

মুগকল্যাণের শ্রীবিমল কৃষ্ণ পালের পিতা ৺নলিনী কান্ত পাল। বর্তমান বয়স ৫৮ বৎসর। শৈশব থেকে মাতুলালয়ে বাস। কলেজে পড়ার সময় গ্রামের তরুণ সমিতির সভ্য হয়ে অগ্রজ গিরিজাভূষণের অনুপ্রেরণায় নানাপ্রকার জনহিতকর কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত পুস্তক গোপনে পাঠ করে দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার সংকল্প গ্রহণ করেন। কিন্তু কোন পথে অভীষ্ট সিদ্ধ হবে? সেই সময় গ্রামেই সত্যাগ্রহী ক্যাম্প গড়ে উঠেছে। সত্যাগ্রহীর পথই বেছে নিলেন। নিষিদ্ধ পুস্তক "দেশের ডাক" প্রকাশ্যে পাঠ করা দণ্ডনীয় অপরাধ। সেই অপরাধেই ন্লুটিয়া হাটে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং বিচারে ৬ মাস কারাদণ্ড। তারও আগে এবং জেলখানার মধ্যে বেশ কয়েকবার পুলিশী নির্যাতন সহ্য করতে হয়।

শ্রীলক্ষ্মণ চন্দ্র ধাড়া (৭৭)

পিতা ৺বিহারীলাল ধাড়া, গ্রাম খাজুরনান, পোঃ মুগকল্যাণ, বাগনান, হাওড়া। বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান। ১৯৩২, ১৯৩৩, ১৯৪০ এবং ১৯৪২ চার বার কারাবরণ এবং মোট ২ বছর ৩ মাস কারাদণ্ড ভোগ। ১৫ বছর বয়সে লবণ আন্দোলনে পুলিশের অত্যাচারে বুকের পাঁজর ভেঙ্গে যায়। নুলিয়া হাটে গাঁজার দোকানে পিকেটিং হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ সত্যাগ্রহ, ৪২ আন্দোলনে যোগদান।

শেষবার কারামুক্তির পর থেকে নানাপ্রকার গঠনমূলক কাজের

সঙ্গে সক্রীয় কর্মী হিসাবে যুক্ত। ১৬ বছর যাবত গৃহত্যাগ করে সর্বক্ষণের জন্য সর্বোদয় কর্মী। জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষা দেন শ্রীচণ্ডীদাস ঘোষ। শ্রীযুক্ত ধাড়ার বর্তমান বয়স ৫৮ বছর।

শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র ঘোষ (৭৮)

পিতা ৺নিত্যগোপাল ২২নং রামেন্দু প্রসাদ মজুমদার লেন, হাওড়া। ছাত্র অবস্থায় যখন চারিদিকে স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল জোয়ার তখনই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের স্থানীয় নেতাদের সংস্পর্শে এসে আন্দোলনের নানা কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ। বার বার নানাপ্রকার পুলিশী অত্যাচার সহ্য করতে হয়। ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গ্রেপ্তার হয়ে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। বর্তমান বয়স ৫৮ বছর।

শ্রীদুর্গাপদ বন্দোপাধ্যায় (৭৯)

শ্রীদুর্গাপদ বন্দোপাধ্যায় (৫৮) মহাশয়, আমতা থানার অধীনে খালনা গ্রামের ৺অঘোর চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। বিদ্যালয়ের পাঠ্যাবস্থায় ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান করিয়া গ্রেফতার বরণ করেন। বাক্সীহাটে গঞ্জিকা মদের দোকানে পিকেটিং করার ফলে দ্বিতীয়বার গ্রেফতার বরণ করেন। বিচারের পর ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। মুক্তির পর তিনি নিজেকে বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত রাখিয়াছেন। আজীবন কংগ্রেস আদর্শে বিশ্বাসী। বর্ত্তমানে অত্যন্ত দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়া দিনাতিপাত করিতেছেন।

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বসু (৮০)

৫২নং সাতকড়ি চ্যাটার্জ্জি লেন, নিবাসী ৺পরেশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের পুত্র শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বসু (৫৮) ছাত্রাবস্থায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হন। পিকেটিং, বিদেশী বস্ত্র বর্জন প্রভৃতি আন্দোলনে যোগ দেন। পরে এইভাবে নানান কার্যের সঙ্গে যুক্ত থাকিবার অভিযোগে ১৯৩৩ সনে ফেব্রুয়ারী মাসে কারাবরণ করেন। শ্রীবসু মহাশয় আজীবন গান্ধীবাদে বিশ্বাসী। তিনি বন্দী থাকাকালীন শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টচার্য এবং শ্রীকৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সাহচর্যে আসেন।

শ্রীকানাইলাল রায় (৮১)

শ্রীকানাইলাল রায় (৫৮) সহাগড়ী গ্রামের ৺হরিপদ রায়ের পুত্র। যৌবনের প্রারম্ভে ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেন। ১৯৩০ সালে মাজুতে কীর্ত্তি বাহাদুর সিংয়ের নেতৃত্বে সারা ভারত জওহরলাল দিবস পালিত হয় তাহাতে তিনি যোগদান করিয়া গ্রেপ্তার হন। চারিমাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। বন্দী অবস্থায় আলিপুর প্রেসিডেন্সী জেলে এবং বহরমপুর জেলে ছিলেন। দ্বিতীয়বার উদয়নারায়ণপুর হইতে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পাঁচ মাসের কারাদণ্ডের আদেশ হয়। তাঁহাকে অন্যান্য বন্দীদিগের সহিত আলিপুর সেন্টাল জেল হইতে হিজলী জেলে লইয়া যাওয়া হয়। বন্দেমাতরম ধ্বনি দিবার দরুণ এক মাস হাত পায়ে বেড়ি দিয়া সেলে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। শ্রীরায় বন্দী অবস্থায় শ্রীবিভূতি ভূষণ ঘোষ (নানু)

শ্রীকীর্ত্তি বাহাদুর সিংকে প্রভৃতি রাজনৈতিক কর্মীদের সাহচর্যে আসেন। তিনি বর্তমানে নিজেকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যের সহিত যুক্ত রাখিয়াছেন।

শ্রীদাম চন্দ্র ভৌমিক (৮১)

বাগনান থানার অধীনে দিলদা গ্রাম নিবাসী ৺পরেশ চন্দ্র ভৌমিকের পুত্র শ্রী শ্রীদাম চন্দ্র ভৌমিক (৫৮) এক সাধারণ চাষীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। অল্পশিক্ষিত শ্রীভৌমিক লবণ আইন ভঙ্গ করিয়া গ্রেপ্তার হন। সমগ্র ভারতবর্ষের খুব শক্তি যখন আন্দোলনের জোয়ারে বিপুলভাবে সাড়া দিয়াছে তখন তিনি মুগকল্যাণ ক্যাম্পে যোগ। লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলনে যুক্ত হইবার অভিযোগে তাহাকে ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। গান্ধীবাদী নেতা শ্রীচণ্ডীদাস ঘোষের সংস্পর্শে তাঁহার রাজনৈতিক জীবন শুরু হইয়াছিল। জেল হইতে মুক্ত হইবার পর অভাবের সংসারে জীবিকা অর্জন হইতে দূরে রাখিতে পারেন নাই। বর্তমানে নিজেকে গান্ধীবাদে বিশ্বাসী রাখিয়া স্ব গ্রামে চাষবাসের দ্বারা জীবিকা অর্জনে রত আছেন।

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ সামন্ত (৮২)

জঙ্গবসাহা পাঁচলা থানার একটি গ্রাম। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এই গ্রামের অধিকাংশ যবকই সক্রীয় কর্মী হিসাবে কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসে। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক কয়েকজন গ্রামবাসীর নেতৃত্বে বালক এবং যুবকগণ আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে নানা নির্যাতন এবং কারাদণ্ড ভোগ করে।

এই গ্রামের ৺সাধন চন্দ্র সামন্তর পুত্র জিতেন্দ্র নাথ ১৯৩০ সালে ৺প্রবোধ কুমার মান্নার নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলনে নেমে পড়েন। পুলিশের হাতে কয়েকবার নির্যাতন, বাড়ী থানা তল্লাসী ইত্যাদির পর কুলডাঙ্গা বাজারে গ্রেপ্তার হন। মুচলেকা দেবার জন্য পিড়াপিড়ি করে বিফল হয়ে চালান দেয়। প্রেসিডেন্সী এবং দমদম জেলে ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। বর্তমান বয়স ৫৮ বৎসর।

শ্রীসুধাংশু শেখর মণ্ডল (৮৪)

শ্রীসুধাংশু শেখর মণ্ডল (৫৮) আমতা থানার খালনা গ্রামের ৺হরিপদ মণ্ডল মহাশয়ের পুত্র। শ্রীমণ্ডল বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীতে পাঠ্যরত অবস্থায় গান্ধীজীর ডাকে লবণ ভঙ্গ আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন। অতঃপর বাগনান থানার বাঙ্গীর হাটে গাঁজা, মদ, আফিঙের দোকানে পিকেটিং করিয়া গ্রেফতার বরণ করেন। তাঁহাকে ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। বন্দী অবস্থায় তিনি আলিপুর জেল পরে দমদম সেন্ট্রাল জেলে থাকেন। ১৯৩১ সালে কারামুক্তির পর হইতে নিজেকে গান্ধীবাদে বিশ্বাসী রাখিয়া স্থানীয় সর্বপ্রকার উন্নতিমূলক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত রাখিয়াছেন। কারাবাস-কালে তিনি শ্রীবিভূতি ঘোষ (নান্টু) প্রভৃতি দেশব্রতীর সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন।

অধ্যক্ষ শ্রীশান্তি কুমার দাশগুপ্ত (৮৫)

সারা ভারতবর্ষে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলন শুরু হইয়াছিল। ঠিক এমনই সময়ে ১৯৩০ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়া

১৫ বছর ৬ মাস বয়সে শ্রীশান্তি কুমার দাশগুপ্ত, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে লবণ আইন ভঙ্গ করতে ৫০ মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করেন। দেশবন্ধুর সহকর্মী শ্রদ্ধেয় ৺যোগেশ চন্দ্র দাশ-গুপ্তের পুত্র শান্তি কুমার ১৯১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। অধ্যক্ষ ভট্টাচার্য, স্বর্গত হরেন্দ্র নাথ ঘোষ, [illegible] বরদা প্রসন্ন পাইনের নেতৃত্বে পিকেটিং করতে গিয়ে ১৯৩০ সালে ৬ মাসের জন্য কারাবরণ করেন। বিভিন্ন আন্দোলনে যোগদান করিবার অভিযোগে তাহাকে কয়েকবার কারাবরণ করিতে হয়। লেবং-এ লাটসাহেবকে বোমা মারার অভিযোগে হিলিতে রাজনীতিক ডাকাতির মামলা ইত্যাদি বিপ্লবীদলের কর্মপ্রচেষ্টায় তাঁহাকে বিশেষভাবে জড়াবার চেষ্টায় বিফল হইয়া ইংরাজ সরকার তাঁহাকে প্রায় ৪ বছরের জন্য স্বগৃহে অন্তরীণ করেন। ১৯৪২ সালে আগষ্ট আন্দোলনে যখন "ভারত ছাড়" দাবী সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছে, ঠিক এমনই এক মূহূর্তে শ্রীদাশগুপ্তকে এক সর্বভারতীয় ষড়যন্ত্রের আসামী করা হয়, সে মামলায় অন্যান্য ১৬ জন আসামীর মধ্যে ছিলেন শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র পরে তিনি পাঞ্জাবের স্পীকার এবং শিক্ষামন্ত্রী হন। আনসার হারবাণী (পরবর্তীকালে, এম, পি,) চীন মিশনের ডাঃ দেবেশ মুখার্জী প্রভৃতি। মামলায় সুবিধা করিতে না পারিয়া তাহাকে তিন বৎসরের জন্য সিকিউরিটি বন্দী করা হয়। ১৯৪৬ সালে তিনি হাওড়ার ৮নং ওয়ার্ড কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। বহু বৎসর অধ্যাপক সমিতির কার্যকরী সমিতির সদস্যরূপে তিনি অধ্যাপক আন্দোলনের পুরো-ভাগে ছিলেন। হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার সময় তাঁহার এবং তাঁহার সহকর্মীদের চেষ্টায় শিবপুর অঞ্চলে দাঙ্গা হইতে পারে নাই। বর্তমানে তিনি বহু সংস্থার সহিত জড়িত। তিনি কিছুদিনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী হইয়াছিলেন, বর্তমানে তিনি শাসক কংগ্রেস দলের এম. এল, এ। তিনি একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী এবং অধ্যক্ষ হিসাবে সুপরিচিত।

শ্রীসুনীল ঘোষাল (৮৬)

বিপ্লবী নায়ক ৺অতুলকৃষ্ণ ঘোষ এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র এবং মন্ত্রশিষ্য নান্টু ঘোষের চেষ্টায় উলুবেড়িয়া অঞ্চলে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যে বলিষ্ঠ সংগঠন গড়ে উঠেছিল তারই অন্যতম কর্মী ছিলেন শ্রীসুনীল ঘোষাল।

১৯৩০ সালে লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে নান্টু ঘোষের সঙ্গেই তিনি ছিলেন। পুলিশ গ্রেফতার করলো। বিচারে ৬ মাস কারাদণ্ড।

শ্রীঅনাথ কুমার মণ্ডল (৮৭)

জয়পুরের ৺অতুল চন্দ্র মণ্ডলের পুত্র অনাথ কুমারের জন্ম ১৯১৫ সালে। ছাত্র অবস্থায় স্বদেশী অন্দোলনে যোগ দিয়ে বাঙ্গালপুর বিভূতি বাবুর শিবিরে শিক্ষালাভ করেন। গ্রামে ফিরে স্থানীয় তরুণদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন ক'রে সুতা কাটা, তাঁত চালানোর ব্যবস্থা করেন। বাছাই ছেলেদের নিয়ে কংগ্রেস অফিস খুলে মদ ও বিলাতি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং চালান। হাওড়া শহরেও স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করেছেন।

বাক্সী হাটে পিকেটিং করার সময় ১৯৩০ সালের অক্টোবর মাসে গ্রেফতার হয়ে ৬ মাসের কারাদণ্ড ভোগ করতে প্রেসিডেন্সী জেলে যান। সঙ্গে ছিলেন স্বগ্রামের আরও অনেক তরুণ কর্মী। সেখানেই জেলার প্রবীণ বিপ্লবী শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় হল। জেল আইন ভঙ্গ করার জন্য কারারক্ষীরা নিষ্ঠুরভাবে মারপিট করে।

বহরমপুর জেলে বদলী। সেখানে ৺হরেন্দ্রনাথ ঘোষ, মনোমোহন রায়, দীনবন্ধু হাজরা, রূপ সিং, নিতাই মণ্ডল প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হন। মুক্তির পর হরেনদার নির্দেশে আবার স্কুলে ভর্তি হয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেন। আই, এস, সি পাশ করে যাদবপুর থেকে কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। সমগ্র ছাত্র জীবন এবং তারপরও গ্রামের কংগ্রেসে সভাপতি ছিলেন। সম্পাদক ছিলেন মৃগাঙ্ক কাঁড়ার। ইউনিয়ন বোর্ডে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হয়ে ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন।

বর্তমানে আসানসোল পলিটেকনিকের প্রবীন শিক্ষক।

শ্রীমুরারী মোহন দে (৮৮)

১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে সাড়া দেন নি এমন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছাত্র বিরল। স্বেচ্ছাসেবক নাম লেখানো অর্থই পিকেটিং করতে হবে। সালিখার মদের দোকানে পিকেটিং করার সময় গ্রেপ্তার। কোর্টের বিচারে ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। কিন্তু গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে ৯ মাস পর মুক্তি। ১৯৩৩ সালে শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তার নেতৃত্বে কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করে আবার গ্রেপ্তার। এবার ৩ দিন পরই ছেড়ে দিল।

পিতার নাম ৺চণ্ডীচরণ দে। নিবাস ১০।৩, নীবপাড়া লেন, সালকিয়া। বর্তমান বয়স ৫৮ বৎসর।

শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত (৮৯)

১৯৩০ সালের অহিংস অসহযোগ এবং বিলাতি বস্ত্র মাদক দ্রব্য বর্জন আন্দোলনে হাওড়া শহরের একজন সক্রীয় কর্মী।

পিতা ৺ললিত মোহন দত্ত। ৯নং নীলকমল চক্রবর্তী লেন, হাওড়া-২ ঠিকানার অধিবাসী।

মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে হরতাল সফল করার কাজে রত অবস্থায় হাওড়া ষ্টেশনে গ্রেপ্তার এবং ২ মাস কারাবাস। তারপর "ভারত ছাড়" আন্দোলনে ১৯৪২ সালে যোগদান করার অস্ত্র আইন এবং আন্তঃরাজ্য ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার। বিচারে কোন দণ্ড দেওয়া গেল না। তাই এক বছর সিকিউরিটি প্রিজনার হিসাবে আটক করে রাখলো। আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে এক বছর পর মুক্ত।

শ্রীহরিদাস মিত্র (৯০)

বয়স ৫৮ বৎসর। পিতা ৺মন্মথ মিত্র। গ্রাম ঃ গোপালপুর, বাগনান, হাওড়া। ১৯৩০ সালে 'বেলিলিয়স পার্ক' ক্যাম্পে প্রথম গ্রেপ্তার ও ৩ মাস কারাবরণ। ১৯৩১ সালে ন্যুনটিয়া হাটে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে গ্রেপ্তার ও হিজলী জেলে ৬ মাস বন্দী।

শ্রীযুগোল কিশোর নিয়োগী (৯১)

উদয়নারায়ণপুর থানার রামপুর গ্রামের ৺দুর্গাপদ নিয়োগীর পুত্র যুগোল কিশোরের জন্ম ১৯১৫ সালে। পিতা সামান্য বেতনে আদালতে কাজ করতেন। মাতুলালয়ে থেকে পাঠ্যাবস্থায় হাওড়া কংগ্রেসে স্বেচ্ছাসেবকরূপে যোগদান। তখন তেলকল ঘাট রোডে কংগ্রেস অফিস ছিল। সারা জেলায় নানাপ্রকার আইন অমান্য আন্দোলন এই কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হত। এখান থেকে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক এবং সংগঠনকর্মীরা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তেন।

১৯৩০ সালের জুলাই মাসে পুলিশ একদিন কংগ্রেস অফিস ঘেরাও করে শ্রদ্ধেয় হরেন্দ্র নাথ ঘোষ সহ ৪৬ জন কর্মীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। বিচার হল, হাওড়া কোর্টে। সাজা ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড। জেল খাটার পর দেশসেবার অভিজ্ঞতা এবং আগ্রহ দুই বেড়ে গেল। সারা জীবন দেশসেবার কাজেই নিযুক্ত আছেন।

শ্রীরামচন্দ্র হাজরা (৯২)

জঙ্গারসাহা গ্রামের ৺বিহারী লাল হাজরার পুত্র রামচন্দ্র (৫৭) নেহাৎ বালক অবস্থাতেই স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেয়। নানা আন্দোলনে বার বার পুলিশের নির্যাতন তাঁকে কাবু করতে পারে নি। মোট পাঁচবার জেল খাটতে হয়েছে, তবুও নিরুৎসাহ না হয়ে আবার আন্দোলনের সামিল হয়েছেন। প্রথমবার হাওড়া কোর্ট দখল করার সংগ্রাম, দ্বিতীয়বার উলুবেড়িয়া ষ্টেশনে গ্রেপ্তার। তৃতীয়বার শিবপুর কনফারেন্সের স্বেচ্ছাসেবক হবার অপরাধ। চতুর্থবার শ্যামপুর-শশাটী গ্রামে পিকেটিং এবং পঞ্চমবার কংগ্রেস ডেলিগেট ক্যাম্প সার্চ করে গ্রেপ্তার। মোট ১৯৷৷০ মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৯৩)

পিতা ৺বিজয় গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রাম ঃ পূর্বন্নপাড়া, পোঃ মাকড়দহ, হাওড়া। ১৫ বছর বয়সে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান। ১৯৩০ সালে গ্রেপ্তার এবং ৬ মাসের কারাদণ্ড। প্রেসিডেন্সী জেলে থাকাকালীন ১লা জুলাই ১৯৩০ তারিখে জেলে পাগলা ঘন্টি বেজে উঠলো। হঠাৎ পুলিশের দল ব্যারাকে ঢুকে

এলোপাথারি লাঠিচালনায় গুরুতরভাবে আহত। বর্তমান বয়স ৫৭ বছর।

শ্রীগোষ্ঠ বিহারী মাইতি (৯৪)

বাগনান থানার তুর্লভপুর গ্রামের ৺শশীভূষণ মাইতি চাষ বাস নিয়ে থাকেন। তার পুত্র গোষ্ঠবিহারী সামান্য লেখাপড়ার পরই বাবার সঙ্গে চাষের কাজে নেমে পড়েছে। কিন্তু এদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পৌঁছে গেছে। সুভাষচন্দ্র বসু যুবজনচিত্তের অনেকটা অংশ দখল করে ফেলেছেন। সেই সুভাষচন্দ্রের আহ্বান স্থানীয় নেতা লক্ষ্মণদার মাধ্যমে। বাড়ীর লোকের অজ্ঞাতসারে ছুটে গেলেন কলকাতায়। ডালহৌসী স্কোয়ারে হলওয়েল মনুমেন্ট ভারতবাসীর বিরুদ্ধে ইংরাজদের মিথ্যা ইতিহাস রচনার স্বাক্ষী। "ভেঙে ফেল এই মনুমেন্ট" নেতার এই আহ্বান কার্যকরী করার জন্য সেনানী দলকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলো। বিচারে ৯ মাস জেল। জেল নয় যেন তীর্থস্থান। আজ কোথায় জাতীর প্রিয়তম নেতাজী? দেশবাসীর তুঃখ আজও কেন ঘুচলো না?

শ্রীমণিমোহন সরকার (৯৫)

পুত্র মণিমোহনের বয়স যখন ৪ বৎসর মাত্র তখনই পিতা ৺শরৎচন্দ্র সরকার (মুগকল্যাণ) চোখ বুঝলেন। সেটা ১৯১৯ সাল। ভগ্নীপতির সাহায্যে চলে। তিনিও গত হলেন ১৯৩০ সালে। সহায় সম্বলহীন অনাথ। বিদ্যালয়ে বিনা বেতনের ছাত্র। দেশজননীর মুক্তির ডাক এই বালকের মনকেও চঞ্চল

করে তুললো। শহর ছেড়ে কলেজের ছাত্ররা গ্রামে এসে আন্দোলনকে জোতদার করে তুলছে। বাগনান থানায় বেশ কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবক ক্যাম্প স্থাপিত হয়েছে। নেতারা নির্দেশ, উপদেশ দিচ্ছেন। মণিমোহন নিজের অবস্থার কথা বিস্মৃত হয়ে যোগ দিলেন স্বেচ্ছাসেবক শিবিরে। তারপর আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ, গ্রেপ্তার ও ৬ মাস কারাবরণ। ফিরে আসার পর বিদ্যালয়ের সম্পাদক আর স্কুলে নিলেন না। জেলের মধ্যে থাকার সময় উলুবেড়িয়ার শ্রীবিভূতি ঘোষ (নান্টু) মহাশয়ের নিকট রাজনীতি এবং শরীর চর্চার উন্নত পথের সন্ধান। খালোড় গোপীমোহন স্কুল তখন নূতন। সেখানে ভর্তি হয়ে ১৯৩৩ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। বিভিন্ন সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান এবং ক্ষুদ্র শিল্প প্রসার কাজের মধ্যে এখনও যুক্ত আছেন। বর্তমান ঠিকানা ২১৮, হাজারহাত কালীতলা লেন, হাওড়া-৪।

শ্রীবিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (৯৬)

বর্তমানে শিবপুর ক্ষেত্র মিত্র লেনের অধিবাসী শ্রীবিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাল্যজীবন কাটে বালিতে। সেখানে শ্রীপ্রফুল্ল সেন, ৺সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদির সঙ্গে শৈশবেই পরিচয় ঘটে। রিভার টমসন স্কুলে পড়ার সময় ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেন।

১৯৩০ সালে ৺হরেন্দ্র নাথ ঘোষের নির্দেশে দ্বিতীয় দলের স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে লবণ আইন অমান্য করতে মাজু গেলেন। গ্রেপ্তার হলেন। বিচারে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড। বেরিয়ে এসে মন্দিরতলায় কংগ্রেস পতাকা উত্তোলনের অপরাধে আবার ৩ মাস কারাদণ্ড। মুক্তির পর ডাক পড়লো মদের দোকানে পিকেটিং করার। প্রথমে লুইস সাহেব বুটের আঘাতে নাকের হাড় ভেঙ্গে দিল তারপর গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। এবার ৬

মাস জেল। ১৯৩২ সালে শ্রীগুরুদাস দত্তের নেতৃত্বে শশাটীতে লবণ আইন অমান্য করতে গিয়ে আবার ৬ মাস কারাদণ্ড। ইতিমধ্যে হিন্দুস্থান সোসালিষ্ট রিপাবলিক্যান আর্মি বিপ্লবীদলে যোগ দেন। ৺কালী সেন, শ্রীগণেশ মিত্র, শ্রীবলাই সিংহ, ৺জীবন মাইতি, শ্রীকানাই বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺অগম দত্ত এবং ৺বিপিন গাঙ্গুলীর সঙ্গে কাজ করেছেন।

১৯৩৮ সালে শিবপুর শক্তি সঙ্ঘের মাধ্যমে যুবসংগঠন এবং সমাজসেবার কাজ করেছেন। পুলিশের চাপে সঙ্ঘের নাম এবং কমিটিও বদল করে হরিজন বিদ্যালয় খোলা হয়। হোমিওপ্যাথী পাশ করে দাতব্য চিকিৎসা করেন।

শ্রীবাবুরাম খাঁ (৯৭)

পাঁচলা থানার শুভরআড়া গ্রামের ৺তুথীরাম খাঁ-এর পুত্র বাবুরামের ১৯১৬ সালে জন্ম। বালক বয়সেই জুজারসাহার ৺প্রবোধ কুমার মান্নার আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে কুলডাঙ্গা বাজারে ঘেরাও করে মারধর করে এবং বিচারের ৬ মাস জেল। প্রেসিডেন্সী এবং দমদম জেলে থাকতে হয়।

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র বসু (৯৮)

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র বসু (৫৬) হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার নতীবপুর গ্রামের ৺যতীন্দ্র মোহন বসুর কনিষ্ঠ পুত্র। শ্রীযুত বসু বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করিবার সময় গান্ধীজীর আহ্বানে জাতীয় আন্দোলনের সহিত নিজেকে যুক্ত করেন। ১৯৩৩ সালে তাঁহার সংগ্রামী জীবনের শুরু। মদের দোকানে পিকেটিং, বিলাতী দ্রব্য বয়কট ইত্যাদি আন্দোলনে সক্রীয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩৩

সালে গ্রেপ্তার হন এবং ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। কারাবাসের সময়ই রাজনৈতিক চিন্তার পরিবর্তন হয় এবং বৈপ্লবিক আন্দোলনের অংশীদার হন। পরবর্তীকালে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মতাদর্শে সক্রীয় কর্মী হন। নেতাজীর অন্তর্ধানের পর যে সমস্ত দায়িত্বশীল কর্মীর মাধ্যমে ভারতখণ্ডে গোপন আন্দোলনের পরিকল্পনা চালু রাখার প্রস্তাব চলিতেছিল শ্রীযুত বসু তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। নেতাজীর ইম্ফল, কোহিমা প্রবেশ করার সময় এই পরিকল্পনা ব্রিটিশ সরকার জানিতে পারেন এবং ৺মুকুন্দলাল সরকার, ৺হরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীহরিদাস মিত্র, ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্যের সহিত ইনি গ্রেপ্তার হন। প্রবোধবাবুকে নানান নির্যাতনের পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইনি বর্তমানে ৭নং সাতকড়ি চ্যাটার্জী লেন, হাওড়াতে বসবাস করেন।

শ্রীউমাশঙ্কর রায় (৯৯)

আমতা থানার খালনা গ্রামে ১৯১৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন ৺বিমলাকান্ত রায়ের পুত্র উমাশঙ্কর।

বিদ্যালয়ের ছাত্র অবস্থায় লবণ আইন অমান্য করেন। তারপর ১৯৩০ সালে বাক্সীহাটে মদ ও গাঁজার দোকানে পিকেটিং করায় গ্রেপ্তার হন। উলুবেড়িয়া এস-ডি-ও ৬ মাসের সাজার আদেশ দিলেন। জেল থেকে মুক্তি পাবার পর সমাজকল্যাণকর নানা প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত থেকে কাজ করেছেন।

শ্রীঅজিত কুমার ঘোষ (১০০)

পিতা ৺নিঘোর চন্দ্র ঘোষ, নিশ্চিন্দা সরকারী কলোনী ২নং পোঃ ঘোষপাড়া, বালী হাওড়া। পূর্বের ঠিকানা—গ্রাম ঃ যন্ত্রাইল,

পোঃ নবাবগঞ্জ, ঢাকা। বালক বয়সে স্বাধীনতা আন্দোলনের সক্রীয় কর্মীদের সংস্পর্শে এসে জাতীয় চেতনার উন্মেষ। তারপর নানা আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে অংশগ্রহণ। ১৯৩: সালের অক্টোবব মাসে গ্রেপ্তার এবং ১।৹ বৎসর কারাবাসেব পর ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসে মুক্তি। আজীবন কংগ্রেস কর্মী। বর্তমান বয়স ৫৬ বছব।

শ্রীঅনীষ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১০১)

১৯৩২ সালে রামরাজাতলার চৌধুরী পাড়াব মাঠে রাজনৈতিক সভা হচ্ছে। অনেক দুর থেকে ছাত্র-যুবকরা এসেছেন। হঠাৎ পুলিশের আবির্ভাব। ঘেরাও করে সবাইকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। একরাত্রি হাওড়া হাজত, তারপর আলীপুর জেল হাজত। ১৯৩২ সালের ২রা জানুয়ারী হাওড়া কোর্টে বিচার হল। ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করার জন্য প্রথমে আলীপুর জেল এবং তারপর হিজলী জেলে বদলী করা হল। সেখানে জেল কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় নানাপ্রকার সাজা পেতে হয়। শেষ পর্যন্ত সকলে মিলে অনশন করেন। সেই অনশনে সহবন্দী শ্রীঅরুণ বন্দোপাধ্যায় কয়েকদিন পরই খুব দুর্বল হয়ে পড়েন এবং একদিন চৈতন্য হারাণ। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগাব লুণ্ঠন মামলার আসামী ডাঃ নৃপেন্দ্র নাথ কর তখন হিজলী জেলে বন্দা। তিনিই অনশন বন্দীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে অনশন ভঙ্গ করার পরামর্শ দেন। আট দিন পর অনশন ভঙ্গ করা হয়। আবার মেদিনীপুর জেলে বদলী করে। সেখান থেকেই মুক্তিলাভ করেন উলুবেড়িয়া থানার কৈজুড়ী গ্রামের ৺হরিপদ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র অনীষ ১৯১৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীবিভূতি ভূষণ মুখার্জী (১০২)

মাকড়দহ পূর্বন্নপাড়ার বিভূতি ভূষণ ছাত্রাবস্থায় হাওড়া জেলা কংগ্রেস সদর দপ্তরে স্বেচ্ছাসেবক হলেন। স্কুলের পালা সাঙ্গ। জেলার নেতা হরেন বাবুর নির্দেশে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে কর্মীদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে চলেন। মাঝে মাঝে পিকেটিং, সভা, শোভাযাত্রায়ও যোগ দিতে হয়। মাকড়দহ মদের দোকানে পিকেটিং করায় পুলিশ গ্রেপ্তার করে। হাওড়া থানা এবং জেল হাজতে ২০-২৫ দিন থাকার পর বিচারে ৬ মাস কারাদণ্ডের আদেশ হল। প্রেসিডেন্সী জেল-এ থাকার সময় প্রখ্যাত নেতা সতীন সেনের উপর নির্মম পুলিশী অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেন এবং নিজেও প্রহৃত হন। রেল বিভাগে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী।

শ্রীসুধাংশু শেখর মুখোপাধ্যায় (১০৩)

ছাপ্পান্ন বছর বয়স্ক শ্রীসুধাংশু শেখর মুখোপাধ্যায়ের বৃদ্ধ পিতা শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় এখনও জীবিত আছেন। বাল্যকালের বাসস্থান দশরথ ঘোষ লেন থেকে ৫নং কালীচরণ দাস লেন ঠিকানায় বর্তমান নিবাস।

সালিখায় ১৯৩০ সালে যে কিশোর এবং যুবকের দল আইন অমান্য ইত্যাদি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন সুধাংশু কুমারও সেই দলে ছিলেন। সালিখা মদের দোকানে পিকেটিংরত অবস্থায় গ্রেপ্তার হয়ে ২ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন কিন্তু ৯ মাস পর গান্ধী আরউইন চুক্তির ফলে মুক্তিলাভ করেন। আবার ১৯৩২ সালে শোভাযাত্রা করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অপরাধে ৬ মাস জেল খাটেন। ১৯৩৩ সালে তৃতীয়বার গ্রেপ্তার হয়ে ৩ দিন পর মুক্তিলাভ করেন।

শ্রীদিবাকর খাঁ (১০৪)

পিতা ৺বসন্ত কুমার খাঁ, গ্রাম ঃ খাঞ্চাদাপুর, পোঃ মুগকল্যাণ, বাগনান, হাওড়া। বর্তমান ঠিকানা—৩১, হরলাল দাস লেন, কলিকাতা-৬। মহাত্মা গান্ধী নির্দেশিত অহিংস-অসহযোগ ও বিলাতি দ্রব্য বর্জন, মাদক দ্রব্য বর্জন আন্দোলনে ১৯৩০ সালে যোগ দান। মুগকল্যাণ সত্যাগ্রহী শিবিরে নেতা শ্রীচণ্ডীদাস ঘোষ মহাশয়ের নিকট জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষালাভ। ১৯৩০ সালে পিকেটিং করার সময় প্রথম গ্রেপ্তার। অল্প বয়স বিবেচনায় মুক্তি-লাভ। আবার আন্দোলনে সক্রীয় কর্মীরূপে আত্মনিয়োগ। দ্বিতীয়বার ১৯৩২ সালে গ্রেপ্তার। বিচারে ৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড। জেলের মধ্যে হরিজনদের মধ্যে কাজ করার সঙ্কল্প গ্রহণ এবং মুক্তির পর ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত হরিজন পল্লীতে থেকে হরিজনদের উন্নতির জন্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ। বর্তমান বয়স ৫৫ বছর।

শ্রীহরিপদ মজুমদার (১০৫)

শ্রমিক আন্দোলনের নেতা শ্রীহরিপদ মজুমদার প্রথম জীবনে কলেজ ছেড়ে ঢুকলেন গেষ্ট কিন উইলিয়াম কারখানায়। সেখান থেকেই কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের সভ্য হয়ে রাজনৈতিক জীবনের শুরু। জন্ম কিন্তু নোয়াখালী জেলার ফেণী মহকুমার অন্তর্গত দক্ষিণ মন্দিরা গ্রামে। পিতা ৺বসন্ত কুমার মজুমদার। বর্তমান নিবাস ১।৪, রামলোচন সায়ার ষ্ট্রীট, বেলুড়মঠ, হাওড়া।

'৪২ আন্দোলন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মগোপন করে বিপ্লবী আন্দোলনে আঞ্চলিক পরিচালনার দায়ীত্ব গ্রহণ করেন।

পুলিশও আত্মগোপনকারীদের পিছনে লেগেই আছে। শেষ পর্যন্ত অস্ত্র শস্ত্র এবং বোমা ইত্যাদি রাখার অপরাধে কলকাতায় পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। বিচারে অপরাধ প্রমাণ হল না কিন্তু ৬ মাস কারাদণ্ড তবুও হল। মেয়াদ শেষে জেল থেকে বেরিয়ে আসার দিন আবার গ্রেপ্তার করে রাজবন্দী হিসাবে আলীপুর জেলেই আটক করা হল। দু'বছর পর ১৯৪৫ সালে অন্যান্য রাজবন্দীদের সঙ্গে মুক্তিলাভ করেন।

শ্রমিক আন্দোলন ছাড়াও বাস্তুহারা কল্যাণ, খাদ্য আন্দোলন এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নিরলস কর্মী। রাজনীতি বিষয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। "সমাজতন্ত্র কোন পথে", "যুগে যুগে সমাজ", "ভারতবর্ষে গরীব কারা ?" "কংগ্রেসী পরিকল্পনায় স্বরূপ ও সমাজতান্ত্রিক বিকল্প" ইত্যাদি পুস্তকের রচয়িতা।

এখনও নানা জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার সরকার (১০৬)

৺শরৎচন্দ্র সরকারের পুত্র প্রফুল্ল কুমার ১৯১৮ সালে মুগকল্যাণ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ২ বছর বয়সে পিতৃহীন হন। ১৯৩০ সালে গ্রামের লাইব্রেরীতে যখন শ্রীচণ্ডীদাস ঘোষ ভলান্টিয়ার ক্যাম্প করেন তখনই গ্রামের বালকদের মনে স্বাধীনতার চেতনা জাগ্রত হল। ছোটদের দলে নানাস্থানে পিকেটিং। ক্যাম্পে প্রফুল্ল কুমারের মাতাও স্বেচ্ছাসেবক নানাপ্রকার সাহায্য এমন কি রান্নাও করে দিয়ে যেতেন। পুলিশ এসে সব লণ্ড ভণ্ড করে দিত। রাজনীতির পাঠ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার এবং প্রথম দফায় ৬ মাস কারাবাস। জেলের মধ্যে অনেক অভিজ্ঞ নেতা ও কর্মীর সঙ্গে পরিচয় এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে মুক্তির পর আবার পুরোদমে আন্দোলনে যোগদান। দ্বিতীয় দফায় গ্রেপ্তার

হলেন ১৯৩২ সালে রামরাজাতলায় ছাত্র কনফারেন্স-এ স্বেচ্ছা-সেবক হওয়ার অপরাধে। ৫ মাস জেল হল। প্রথমে আলীপুর তারপর হিজলী। মুক্তির পর মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি গ্রামে পুলিশের অত্যাচারের চিহ্ন দেখে নিজের গ্রামে ফিরে আসেন। পরবর্তীকালে গঠনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এখনও আছেন।

শ্রীনির্মল চন্দ্র দাস (১০৭)

বলুহাটির পরই হাওড়া জেলার সীমানা শেষ এবং হুগলী জেলার আরম্ভ। জনাই তখন এই অঞ্চলের বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। স্বদেশী আন্দোলনের স্থানীয় নেতৃত্ব স্বাভাবিক ভাবেই এখান থেকেই এলো। শ্রী গিরিজা মুখার্জি, ফণী মুখার্জি, এবং অনাথ মিত্র গুপ্ত সমিতি পরিচালনা করেন বিপ্লবী নেতা বিপিন গাঙ্গুলী মহাশয়ের নির্দেশে। বালক বয়সে বলুহাটির ৺ফকির চন্দ্র দাসের পুত্র এই স্বদেশীওয়ালাদের সংস্পর্শে এলেন। স্বদেশহিত ব্রতে দীক্ষা হল। বিপ্লবী নায়ক বিপিন চন্দ্র যখন বলুহাটি গ্রামে আত্মগোপন করে ছিলেন ৺কিশোরী মোহন পাঁজা এবং ৺সুরেন কুমারের বহি-বাটিতে তখন তাঁরও সঙ্গে ঘটলো সাক্ষাৎ পরিচয়। গ্রামের যুবকদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল গুপ্ত সমিতির শাখা। কিন্তু ১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধীর ডাকে সবাই যোগ দিলেন অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনে। বাজারে পিকেটিং করে ধৃত হলেন। ৬ মাস কারাবাসের পর গ্রামে ফিরে নারনা ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরবর্তীকালে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। বলুহাটি উচ্চবিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয় এবং সাধারণ পাঠাগার পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বর্তমান বয়স ৫৫ বছর।

শ্রীসতীশ চন্দ্র সামন্ত (১০৮)

আমতা থানার খড়িয়পের নিকটবর্তী সেহাগড়ী গ্রামের ৺মতিরাম সামন্তর পুত্র শ্রীসতীশচন্দ্র সামন্ত বর্তমানে ২৫৯/২, নেতাজী সুভাষ রোডের অধিবাসী।

ছাত্র অবস্থায় আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩২ সালে ধরা পড়ে সেণ্ট্রাল জেলে কিছুদিন বন্দী থাকার পর উদয়-নারায়ণপুরে বেআইনী সভায় যোগদানের অপরাধে গ্রেপ্তার হলেন। বিচারে ৬ মাস জেল। প্রেসিডেন্সী জেল এবং হিজলী ক্যাম্প জেলে ছিলেন। সেখানে ৺হেমন্ত বসু এবং কুমিল্লা অভয় আশ্রমের শ্রীনৃপেন বসু এবং শিবপুরের শ্রীগুরুদাস দত্ত প্রভৃতির সাহচর্য লাভ করেন। অদ্যাবধি কংগ্রেসের সঙ্গেই আছেন।

শ্রীশিশির কুমার রায় (১০৯)

৬৬/৫, অতীন্দ্র মুখার্জী লেন নিবাসী শ্রীশিশির কুমার রায় ১৯১৭ সালে হুগলী জেলার পুড়শুড়া থানার অন্তর্গত শ্যামপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ৺বসন্ত কুমার রায়।

১৯৪০ সালে কংগ্রেস কর্মী হিসাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। প্রথম কাজ ছিল কংগ্রেসের বাণী এবং আন্দোলনের ডাক প্রচার করা: হুগলী, বাঁকুড়া এবং বর্দ্ধমানের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভ্রমণ করতে হয়। দিল্লী অভিযানকালে ধরা পড়েন বরাকরে। আসানসোল আদালতের বিচারে কারাদণ্ড হল। আসানসোল, বর্দ্ধমান এবং হুগলী জেলে কারাবাস করেন। মুক্তির পর আত্ম-গোপন করে "ভারত ছাড় আন্দোলনে" কাজ করেন। গ্রেফতার করে পুলিশ মামলা চালায়। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত মামলা চলে

ভারতরক্ষা আইনসহ আরও কয়েকটি ধারায়। বিচারাধীন বন্দী-রূপে এক বছর হুগলী জেলেই কাটে। ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের সময় জামিনে খালাস হয়ে ত্রাণকার্যে আত্মনিয়োগ করেন।

শ্রীরমেশ চন্দ্র দাস (১১০)

চেতলা স্কুলের ছাত্র রমেশ চন্দ্র। ১৯৩৫ সালে রাখী সংঘের সভ্যরূপে পিকেটিং দিয়েই রাজনৈতিক কাজে হাতে খড়ি হল। সুভাষচন্দ্রের নামে ছেলেরা তখন পাগল। তাঁরই নির্দেশিত পথে ১৯৩৭ সালে ছাত্র আন্দোলনে যোগদান করলেও ১৯৩৯ সালে চলে গেলেন আমেদাবাদ। সেখানে শ্রমিক আন্দোলনে নেমে গেলেন। না, আরও বড় কিছু করা চাই চিন্তা দেশ ছাড়া করলো। ১৯৪১ সালে মালয়েশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নির্দেশে গুপ্তচর হিসাবে বৃটিশ সৈন্যবাহিনীতে যোগদান। মিলিটারী সিক্রেট সার্ভিস টের পেয়ে আটক করলো। তারপর ১৯৪২ সালে পুরোপুরি আজাদ হিন্দ বাহিনীতে যোগদান করে বাটাভিয়া, সুরেবায়া, বালী, টাইমূর ইত্যাদি স্থানে জাপানীদের হাতে বন্দী বৃটিশ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রচারকার্য করেন। ১৯৪৪ ও ৪৫ সালে আই, এন, এ সদস্য হয়ে বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন। ১৯৪৫ সালে যুদ্ধবন্দী হিসাবে ধৃত হয়ে ভারতে প্রত্যাবর্তন। ১৯৪৬ সালে মুক্তির পর ময়মনসিংহে শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র জোয়ারদারের নেতৃত্বে গঠিত সুভাষ বাহিনীকে ট্রেনিং দেন। তারপর মেজর সত্য গুপ্তর নির্দেশে বরিশালে এবং ঢাকায় সুভাষ বাহিনী গঠন। সতীন সেনের সহিত যোগাযোগের কিছুদিন পর আবার শ্রমিক আন্দোলনে ফিরে এলেন। হাওড়া, ২৪ পরগণা, রাণীগঞ্জ ইত্যাদি অঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলনে সক্রীয় কর্মী ছিলেন। ১৯৬৯ সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হবার পরও

১৯৭০ সালে বোকারোতে শ্রমিক আন্দোলন সংগঠন করেন।
বর্তমানে একদিকে হৃদরোগে এবং অন্যদিকে ফুসফুসের রোগে শয্যাশায়ী। ৫৫ বৎসর বয়স্ক রমেশ চন্দ্রের পিতার নাম ৺রাইচাঁদ দাস। আন্দুলের কাছে ঝোড়হাটে বাস করেন।

শ্রীইন্দুভূষণ ব্যানার্জি (১১১)

বালক ইন্দুভূষণের মনে স্বাধীনতার চেতনা জাগ্রত হয় ৺জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয়ের একটি বক্তৃতা শুনে। ১৯২৯ সালে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগ দেন। ৺সুধাংশু মুখার্জী, শ্রীবিপিন বসু এবং শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্তী ইত্যাদির অধীনে স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন।

১৯৩০ সালে বনগ্রাম শহরে কংগ্রেস অফিসে থেকেই কাজ করেছেন। ১৯৩০ সালেই মহাত্মাগান্ধীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে হরতাল সংগঠনের অপরাধে ধরা পড়ে ১ মাস বিচারাধীন বন্দী থাকার পর ১০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। যশোহর জেল থেকে বেরিয়ে যশোহর কংগ্রেস অফিসে থাকার সময় প্রচণ্ড পুলিশ অত্যাচার সহ্য করেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে কলিকাতা আসেন। হাওড়া বেলিলিয়স পার্ক এবং রামরাজাতলা স্বেচ্ছা-সেবক শিবিরে কাজ করেন। বড়বাজারে পিকেটিং করে এক মাস কারাদণ্ড হয়।

হিন্দুস্থান সোসালিষ্ট রিপাবলিক্যান আর্মি বিপ্লবী দলের হাওড়া শাখায় যোগ দেন। বাগবাজারে অস্ত্র প্রাপ্তির পর খুব ধড়পাকড় শুরু করলে অস্ত্রসহ আত্মগোপন করেন। এই সময় মাঝে মাঝে শ্রীবলাই চন্দ্র সিংহের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কদমতলার শ্রীঅনাদি মুখার্জী ও আশ্রয় দিয়েছিলেন। বিপিনদা তখন শিবপুরে বেণীবাবুর বাড়ীতে আত্মগোপন করেছিলেন। ৺অগম দত্তর নির্দেশে যোগাযোগ রক্ষার কাজ করতেন। এই

সময় ঢাকার শ্রীসঙ্ঘের শ্রীবারীন ঘোষের সঙ্গে সংযোগ হবার ১০-১২ দিন পরই অস্ত্র সমেত কলিকাতার হ্যালিডে পার্কে ধরা পড়েন। বারীন ঘোষও একই সঙ্গে ধরা পড়েন। বিচারে ৫ বছর কারাদণ্ড। মুক্তি পাবার পর ওয়াকার্স লীগ এবং কংগ্রেসে কাজ করেন। সোসালিষ্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। মোটর ডাকাতির কেসেও ধরা পড়েছিলেন। ৺বিপিন গাঙ্গুলী মহাশয়ের ব্যক্তিগত সচিবরূপে কাজ করেছেন। জন্ম ১৯১৮ সালে। পিতার নাম শ্রীসতীশ চন্দ্র ব্যানার্জী। বর্তমান নিবাস ২৭নং শেখপাড়া লেন- হাওড়া-৪।

শ্রীনন্দকুমার মুখোপাধ্যায় (১১২)

গান্ধীজীর ডাকে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন বালক বয়সেই। ৩৯১নং জি, টি. রোডে জন্ম, বর্তমান বাসস্থান ২১নং দেবেন্দ্র গাঙ্গুলী রোড, হাওড়া-৩। পিতা ৺ভগবান চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রথমে লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলনে অংশগ্রহণ। পরে মাদক বর্জন আন্দোলনে শিবপুর মদের দোকানে পিকেটিং করার সময় গ্রেপ্তার ১৯৩০ সালে ৯ই জুলাই। ধরার পর একচোট বোলাই। তারপর বিচার এবং ৬ মাস কারাদণ্ড। জেলের মধ্যে ১লা আগষ্ট প্রচণ্ড মারধর এবা ডাণ্ডাবেড়ী। বহরমপুর স্পেশাল জেলে স্থানান্তরিত। মুক্তির পর আবার আন্দোলনে অংশগ্রহণ। ১৯৩২ সালের ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উত্তোলনের সময় মন্দিরতলায় পুলিশ আবার গ্রেপ্তার করে। এবার সাজা ৫ মাস। জেলের আইন মানতে অস্বীকার করায় বিভিন্ন রকমের সাজা ভোগ করে দমদম জেলে বদলী। প্রহারের ফলে দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ভেঙ্গে যায় এবং চক্ষুতেও আঘাত লাগে। বর্তমান বয়স ৫৪।

শ্রীকার্তিক চন্দ্র সেনাপতি (১১৩)

আমতা থানার আন্দুলিয়া গ্রামের শ্রীকার্তিক চন্দ্র সেনাপতি ৺বিপিন বিহারী সেনাপতির পুত্র। বর্তমান বয়স ৫৩। শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত আছেন।

ছাত্রজীবনে কলিকাতা স্কটিশ চার্চ স্কুল এবং কলেজের ছাত্র ছিলেন। কলেজে পড়ার সময় অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। ১৯৩৫ সালে নিজ গৃহ থেকে ২২ ভরি সোনার গহনা নিয়ে বিপ্লবী দলের তহবিলে জমা দেন। আর বাড়ী ফিরলেন না। সর্বসময় আত্মগোপন করে দলের কাজ নিয়েই থাকেন। ১৯৩৫ সালের ১৩ই এপ্রিল দু'জন সহকর্মী শ্রীঅজিত মজুমদার এবং দেবব্রত রায় সহ পুলিশের হাতে ধরা পড়েন খিদিরপুর ট্রাম ডিপোর সামনে। টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলার আসামী করে দিল। ১৪ দিন হাজত বাসের পর আলীপুর জেলে বিচারাধীন বন্দীরূপে ২ বছর কাটে অবশেষে বিচারপর্ব শেষ হল ট্রাইবুনাল আদালতে। সাজা হল ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। আলীপুর জেল থেকে ঢাকা জেল। সেখানে অনশন ধর্মঘটে যোগ দেন। সহবন্দী হরেন মুন্সীকে জোর করে নাক দিয়ে খাওয়াবার সময় মারা গেল। এক বছর পর দমদম সেন্ট্রাল জেলে বদলী করে। রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য সুভাষচন্দ্র এবং গান্ধীজী সরকারের উপর যে চাপ সৃষ্টি করেন তার ফলে ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মুক্ত হন।

পরবর্তীকালে হাওড়া জেলার কৃষক আন্দোলনে এবং কম্যু-নিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। সঙ্গে শিক্ষকতাও শুরু করেন। চিন্তাশীল কার্তিক চন্দ্র গ্রামীন এবং দেশীয় নানা সমস্যা নিয়ে তথ্যবহুল কয়েকখানা পুস্তক রচনা করেছেন।

শ্রীনিমাই দাস (১১৪)

১৯৩৪ সালে বাংলা দেশের বিশিষ্ট বিপ্লবী শ্রীসৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীনিমাই দাস রাজনৈতিক জীবন শুরু করিয়াছিলেন। শ্রীনিমাই দাস ১৯২০ সালে হাওড়া শহরের ৩১-১০, হালদার পাড়া লেন, কাসুন্দিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা স্বর্গত ননীলাল দাস। ১৯৩৮ সালে আন্দামান রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি শ্রীসৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুর পরিচালিত বিপ্লবী কম্যুনিষ্ট পার্টির সক্রীয় সদস্য হিসাবে শ্রমিক আন্দোলন শুরু করেন। এবং এই অভি-যোগে তাঁহাকে ১৯৪৪ সালে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ তাঁহাকে বন্দী করিয়া হাওড়া জেলে প্রেরণ করে, সেখান হইতে প্রেসিডেন্সী জেলে আনয়ন করিয়া সিকিউরিটি বন্দী হিসাবে রাখা হয়। তিনি কিছুদিন সুন্দরবনে কৃষক আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার রাজনৈতিক জীবনে যাঁহাদের সহিত জেলে কাটাইয়া-ছিলেন তন্মধ্যে মণি গাঙ্গুলী, কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশচীন্দ্র নাথ দে (১১৫)

বয়স ৫১ বৎসর। পিতা ৺খগেন্দ্র নাথ দে। ৫০/৩, বেলি-লিয়স লেন, হাওড়া। প্রাক্ দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধকালে ছাত্রনেতা ও ছাত্রসংগঠক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে কম্যুনিষ্ট পার্টির সাথে মত-ভেদ। ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগদান। নেতাজীর অন্তর্দ্ধানের পর হাওড়া শহর এলাকায় অন্তরীণ। ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে শ্রীকৃষ্ণ-

কুমার চট্টোপাধ্যায় ও ৺হরেন্দ্র নাথ ঘোষ সহ ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার ও প্রেসিডেন্সী জেলে সিকিউরিটি/প্রিজনার হিসাবে প্রায় ৩ বৎসর কারাজীবন যাপন।

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র দাস (১১৬)

সালিখাতে ১৯১২ সালে জন্ম। পিতা ৺অভিরাম চন্দ্র দাস। বালক বয়সে ক্লাবে যাতায়াত করবার সময় বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির কর্মীদের সঙ্গে পরিচয় হয়। তখনই স্বাধীনতা লাভের জন্য সকলের সংগ্রাম করা দরকার এই বোধ জন্মায়।

পরবর্তীকালে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রীয় কর্মী হিসাবে যোগদান করে ৩ বার কারাবরণ করতে হয়। মোট ১০ মাস কারাদণ্ড ভোগ করার সময়ই মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। রাজনৈতিক চেতনা প্রসারের জন্য শিক্ষা প্রসার সর্বাগ্রে প্রয়োজন বিবেচনা করে "বিদ্যাপীঠ" গঠন কর্মে আত্মনিয়োগ।

১৯৪৮ সালে স্বল্প সময়ের জন্য সিকিউরিটি প্রিজনার থাকতে হয়। জনকল্যাণমূলক সকল আন্দোলনের সমর্থক।

শ্রীরাজীব লোচন ঘোষ (১১৭)

শুলুটি গ্রামের ৺পরেশ নাথ ঘোষের পুত্র গ্রামের পাঠশালা ছেড়ে কলকাতা মেট্রোপলিটান স্কুল থেকে ১৯৩৯ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হয়েই রাজনীতির দীক্ষা গ্রহণ করেন ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে। পিকেটিং সভা এবং শোভা-যাত্রায় অংশগ্রহণ করে কয়েকবার পুলিশের লাঠিচার্জের শিকার হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি আকর্ষণ তীব্র হয়। তারই

ফলে ১৯৪২ সালের "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে" ডাক শুনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। হাওড়া জেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে আন্দোলনের প্রতি সমর্থন গড়ে তোলার পর পাঁচলা থানার গঙ্গাধরপুর গ্রামের "অমূল্য বিদ্যামন্দিরে" শিক্ষক থাকাকালে একদিন গভীর রাত্রে গ্রেপ্তার হন। বিচারে ১৫ মাস জেল। কিন্তু এক বছর কারাবাসের পর মুক্তি। ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষে আমতায় লঙ্গরখানা পরিচালনা করেন। বর্তমানে শিক্ষকতায় নিযুক্ত।

শ্রীমদন মোহন ঢ্যাং (১১৮)

পাঁচলা থানার অন্তর্গত জুজারসাহা গ্রামে শ্রীমদন মোহন ঢ্যাং ১৯২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শ্রীহীরালাল ঢ্যাং। শ্রীমদন মোহন ঢ্যাং শৈশবেই, স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান। ১৯৩৯ সালে সংগ্রামী সাধনচন্দ্র মিত্র ও দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গান্ধীজীর ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৪২ সালে আগষ্ট আন্দোলনে যোগদান করিবার অভিযোগে পাঁচলা থানার অধীনে কুলডাংগা গ্রামে তিনি গ্রেপ্তার হন। তাঁহাকে কোমরে দড়ি দিয়া হাওড়া থানায় লইয়া যাওয়া হয়। হাওড়া জেলে দুই-দিন রাখিবার পর তাঁহাকে আলিপুর প্রেসিডেন্সী জেলে সেখান হইতে দমদম স্পেশাল জেলে সিকিউরিটি বন্দী হিসাবে প্রায় ছয়মাস রাখা হয়। ১৯৪৩ সালে 'পুণা সত্যাগ্রহে' অংশগ্রহণ করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৩ সালে অক্টোবর মাসে কার্জন পার্কে বংগীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগদান করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার বরণ করেন, ছয় সপ্তাহ সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি ১ মাসের জন্য স্বগৃহে অন্তরীণ ছিলেন। বর্তমানে শ্রী ঢ্যাং অকৃতদার থাকিয়া সমাজসেবামূলক কার্য্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখিয়াছেন।

করুণাময়ী দেবী (১১৯)

হাওড়া জেলার প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা ৺পুলিন বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্যা সহধর্মীনী করুণাময়ী ঝোড়হাট গ্রামের আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবারের গৃহাঙ্গন ছেড়ে স্বামীর সঙ্গেই রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন।

তখন বাংলার রাজনীতিতে হেমপ্রভা মজুমদার জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, নির্ঝরিণী সরকার প্রমুখ মহিলাবৃন্দ বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে মহিলাদের পরিচালনা করতেন। করুণাময়ী রাজনৈতিক কার্যকলাপের সূত্রে এই নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি স্বামী পুলিন বিহারীর নেতৃত্বে অংশগ্রহণ করে জেলার মধ্যে আইন অমান্য আন্দোলনে প্রথম মহিলা বন্দীরূপে কারাবরণ করেন।
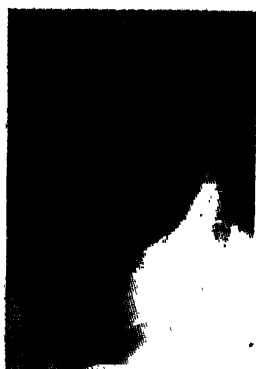
করুণাময়ী দেবী (১১৯)

পুলিন বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

হরেন্দ্র নাথ ঘোষ
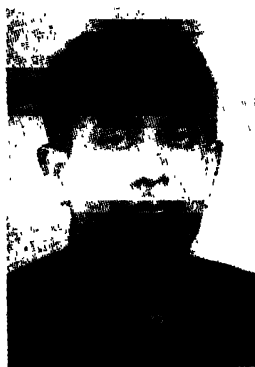
কার্তিক চন্দ্র দত্ত
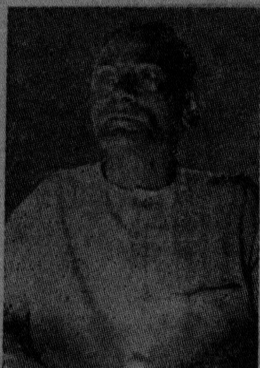
সুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্ঞান ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
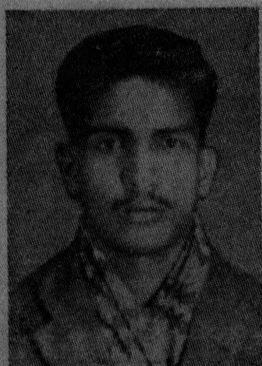
তরেন্দ্র নাথ ঘোষ
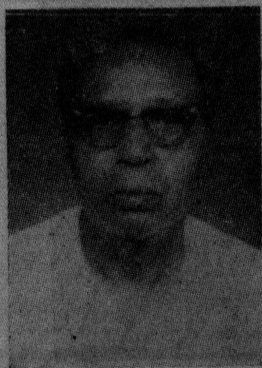
জানকী কুমার ঘোষ

আমরা তোমাদের ভুলবো না

ননীবালা দেবী

কবি গেয়েছিলেন "না জাগিলে আজ ভারত ললনা-এ ভারত বুঝি জাগে না, জাগে না।" বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে বাংলার বিপ্লবীরা নারীদের মধ্যে জাগরণ এনেছিলেন। সংখ্যায় অল্প হলেও নারীরাই তখন আইন বিরুদ্ধভাবে সংগৃহীত পিস্তল, রিভলবার, বন্দুক, নিষিদ্ধ পুস্তক ইত্যাদি লুকিয়ে রাখার দায়ীত্ব অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছেন। গোপনে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছে দিয়েছেন। বাংলার বিপ্লবী দলের সূচনাকারীদের মধ্যেই ছিলেন একজন মহিয়সী নারী, কিন্তু তিনি বিদেশীনী। বাংলার নারীজাগরণে তাঁর দান অসামান্য।

১৯১৫ সাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। ইংরাজের অবস্থা যুদ্ধক্ষেত্রে খুব আশাপ্রদ নয়। প্রবল পরাক্রান্ত ইংরাজ সরকারের এই বেকায়দা অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে বিদেশী শক্তির সহায়-তায় দেশকে স্বাধীন করে তোলার চেষ্টা ভারতের স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীরা করবে এটা স্বাভাবিক। একদিকে প্রচেষ্টা চলছে বিদেশ থেকে জাহাজ বোঝাই করে অস্ত্র শস্ত্র আমদানি এবং অন্যদিকে ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর মধ্যে প্রচারকার্য চালিয়ে বিদ্রোহ ঘটাবার। ইংরাজ সরকারও চুপ করে বসে নেই। সুনিয়ন্ত্রিত গোয়েন্দাবাহিনী বাংলার সর্বত্র জাল পেতেছে। এই জাল ভেদ করেই বিপ্লবীদের আনাগোনা, সলা-পরামর্শ, কাজ কর্ম চলছে।

চন্দননগর তখন ছিল ফরাসী উপনিবেশ। ব্রিটিশ আইন এবং ইংরাজ সরকারের পুলিশ মিলিটারীর প্রবেশ সেখানে ছিল। নিষিদ্ধ। তাই বিপ্লবীরাও চন্দননগরকেই তাদের কর্মকেন্দ্র করে তুলেছিলেন। ইংরাজ পুলিশের হাতে যাদের ধরা পড়ে যাবার

সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে তাঁরাই আশ্রয় নিচ্ছেন চন্দননগরে। স্থানীয় কয়েকটি পরিবার এবং প্রবর্তক সঙ্ঘ ছিল আশ্রয়স্থল। কিন্তু মাঝে মাঝে বিপ্লবীরাই বাড়ী ভাড়া করেও থাকতেন। অন্তত একজন মহিলা না থাকলে বাড়ী ভাড়া পাওয়া যেমন মুস্কিল আবার অন্যদিকে পুলিশের গুপ্তচরকে ধোঁকা দেওয়াও যায় না। তখন বিপ্লবীদলে সক্রীয় মহিলা কর্মী ছিলেন না বললেই হয়।

এই রকম একটি প্রয়োজনে উত্তরপাড়া থেকে বিপ্লবী অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটি মহিলাকে চন্দননগরে বিপ্লবীদের আস্তানায় গৃহিণী হয়ে থাকবার জন্য পাঠালেন। তাঁর নাম ননীবালা দেবী। বিপ্লবীদের আস্তানায় গৃহিণী সেজে পুলিশকে প্রতারিত করতে হবে। রঙ্গীন শাড়ী এবং অলঙ্কার ধারণ করেই ননীবালা এলেন। কিন্তু ননীবালা যে বাল্যবিধবা। মাত্র ১৩ বছর বয়সে বিধবা হবার পর ৮-৯ বছর ব্রাহ্মণ বিধবার কৃচ্ছসাধনা করছেন। তিনি কি করে রঙ্গীন শাড়ী অথবা অলঙ্কার পরবেন? এর চেয়ে মৃত্যুও যে তখনকার দিনে বিধবাদের কাছে শ্রেয় ছিল।

কিন্তু ননীবালা বাল্যকালেই নিকট আত্মীয় অমর চট্টোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। বিধবা হবার পর পরিপূর্ণভাবে স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্মনিবেদনের সুযোগ এলো। তাই ২০-২২ বছর বয়সে অমর বাবুর আহ্বানে একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করে বিপ্লবীদের আস্তানায় যখন উঠলেন তখন তিনি একজন সধবা গৃহিণী। চন্দননগরের আস্তানায় তখন আত্মগোপন করে যারা থাকতেন তাদের মধ্যে ছিলেন বিপ্লবী নায়ক ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অতুল ঘোষ, মন্মথ বিশ্বাস, সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী প্রভৃতি।

বিপ্লবী রামচন্দ্র মজুমদার এবং সুধাংশু মুখার্জী কলকাতায় ধরা পড়ে গেছেন। তাঁদের কাছে যে সব অস্ত্র ছিল তা পুলিশ পায় নি। অন্য বিপ্লবীরাও জানেন না কোথায় সে সব অস্ত্র রামচন্দ্র এবং সুধাংশু লুকিয়ে রেখে গেছেন। কি করা যায়?

ডাক পড়লো ননীবালা দেবীর। রামচন্দ্র মজুমদারের স্ত্রী সেজে প্রেসিডেন্সী জেলে সাক্ষাৎ করতে যেতে হবে। পুলিশের সামনে সাক্ষাৎকারের সময় কৌশলে জেনে নিতে হবে রামচন্দ্র কোথায় অস্ত্র শস্ত্র লুকিয়ে রেখে গেছেন। ননীবালা এই অসাধ্য সাধন করলেন অবলীলাক্রমে। কিছুদিন পরই গোয়েন্দা পুলিশ বিপ্লবী দলে ননীবালার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা জানতে পেরে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে যায়। কিন্তু কোথায় পাবে ননীবালাকে? কখনও কুমারী, কখনও সধবা আবার কখনও বিধবার বেশে ননীবালা তখন এক স্থান থেকে অন্যত্র আত্মগোপন করে থাকছেন। এক বন্ধুর বাড়ীতে থাকার সময় বন্ধুর দাদা বললেন বিপদ এড়াবার জন্য তাঁর সঙ্গে পেশোয়ার যেতে পারেন। রাজী হলেন ননীবালা। পেশোয়ারের পথে এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য কাশীতে নেমেছেন। কাশীর বাঙ্গালী পুলিশ অফিসার সন্দেহ করলেন। দু'দিনের মধ্যে কলকাতা থেকে পাকা সংবাদ নিয়ে ননীবালাকে গ্রেপ্তার করতে গেলেন কিন্তু ততক্ষণে তিনি পেশোয়ারের পথে অনেকটা এগিয়ে গেছেন। পুলিশ সাহেব জীতেন ব্যানার্জী পরদিনই চললেন পেশোয়ার। খোঁজ করে আস্তানার সন্ধান ঠিকই বার করেছেন। গ্রেপ্তার করতে গিয়ে দেখেন ননীবালা কলেরায় আক্রান্ত। ষ্ট্রেচারে করে তুলে নিয়ে এলেন। কাশী পৌঁছে জেলখানায় রাখা হল। সুস্থ হবার পর বিপ্লবীদলের গোপন সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য প্রথমে অনুনয় বিনয় এবং তারপর অত্যাচার। একজন মহিলা কতদিন অত্যাচার সহ্য করে মুখ বুজে থাকবে? কিন্তু ননীবালা দাঁতে দাঁত চেপে সব রকম অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করলেন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে তিনি পুলিশকে কিছুই বলবেন না।

১৯১৭ সালে এপ্রিল মাসে ননীবালাকে কলকাতায় এনে প্রেসিডেন্সী জেলে রাখা হল। ইতিপূর্বে রাজনৈতিক বিশেষত বিপ্লবীদলের কোন মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয় নি। জেলের

মধ্যে ভদ্র মহিলাদের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা নেই। কাজেই প্রথম ৭ দিন ননীবালা কেবলমাত্র জল পান করেই কাটালেন। তারপর অবশ্য অন্য ব্যবস্থা হয়েছিল। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য ইলিসিয়াম রো'তে নিয়ে কয়েকদিন দৈহিক অত্যাচার করে পুলিশ ব্যর্থ হল।

প্রথম মহিলা ষ্টেট প্রিজনার হিসাবে ননীবালাকে ২ বছর প্রেসিডেন্সী জেলেই কাটাতে হল। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর তিনি মুক্তি পেলেন।

এই দুঃসাহসিকা মহিলার আদর্শ অনুসরণ করে পরবর্তীকালে বহু বীরাঙ্গণা বিপ্লবী দলে সার্থক ভূমিকা পালন করেছেন।

বালি দক্ষিণপাড়ার এই মেয়ে ননীবালা।

পুলিন বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

আন্দুল-মৌড়ীর কাছে সরস্বতী নদীর তীরবর্তী ঝোড়হাট গ্রামের এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ৺যোগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র পুলিন বিহারী।

বাল্যকাল থেকেই কৃতী ছাত্র পুলিন বিহারী। ১৯১৪ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ এবং আইন পড়ছেন। ১৯১৬ সালে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইংরাজী সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। এমন সময় বিপ্লবী দলের আহ্বানে জীবনের গতিপথ পরিবর্তন হয়ে গেল। সব কিছু ছেড়ে বিপ্লবী কার্যকলাপে আত্মনিয়োগ করলেন। গোয়েন্দা পুলিশ পিছনে লাগতেই গৃহত্যাগ করেন। কিছুদিন পর আত্ম-প্রকাশ করলেন আলিপুর আদালতে আইনজীবি হিসাবে। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন মত ও পথের রাজনৈতিক ইতিহাস অনুশীলন করার সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সান্নিধ্যে এসে জাতীয় কংগ্রেসেই যোগদান করেন ১৯২১ সালে। সঙ্গে সঙ্গে

অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। বড়বাজারে তাঁরই সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন শ্রীপ্রভুদয়াল হিম্মত সিংকা, শ্রীদুর্গাপ্রসাদ খৈতান ইত্যাদি। আলিপুর কোর্টের আইনজীবি হিসাবে তিনিই প্রথম কারাবরণ করেছিলেন। সেই সময় প্রখ্যাত গান্ধীবাদী নেতা শ্রীসতীশ চন্দ্র দাশগুপ্তর সংস্পর্শে আসেন।

১৯৩০ সালে লবণ আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এ্যালবার্ট হলে যে সভা হয় তাহাতে তিনি প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম সভাপতিরূপে ভাষণ দেন। তারপর আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার জন্য ৬ মাস কারাবাস শেষে আন্দুলে উপস্থিত হলে গ্রামবাসীগণ তাঁহাকে রাজকীয় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

দেশবন্ধু এবং তাঁর মন্ত্রশিষ্য সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে পুলিনবাবু অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে যে মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন পুলিনবাবু।

১৯৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলনে পুলিনবাবু নিজের বাড়ীতেই স্বেচ্ছাসেবকদের শিবির স্থাপন করেন। নিজে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হয়ে কয়েকদিন কারাবাসের পরই মুক্তিলাভ করেন। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের নির্দেশে তখন পুলিনবাবু কাজ করতেন।

উদার মনোভাবসম্পন্ন পুলিনবাবু সবরকম সংকীর্ণতার বিরোধী ছিলেন। তাই ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়ীক দাঙ্গার সময় দেখা যায় তাঁর নেতৃত্বে একদল নিষ্ঠাবান স্বেচ্ছাসেবক অক্লান্ত পরিশ্রম করে করে সাঁকরাইল থানাতে শান্তিরক্ষা করতে সমর্থ হন। পুলিনবাবুর সহধর্মিনী ৺করুণাময়ী দেবীও সক্রীয় রাজনীতিতে স্বামীর যথার্থ সহধর্মিণী ছিলেন।

হরেন্দ্র নাথ ঘোষ

সুভাষচন্দ্র একদিন গর্বভরে বলেছিলেন "হাওড়া আমার দ্বিতীয় দুর্গ" হাওড়া জেলার তৎকালীন সর্বাধিনায়ক নেতা হরেন্দ্রনাথ ঘোষই ছিলেন একাধারে দুর্গের পরিকল্পনাকারী, সংগঠক এবং সেনাপতি।

হরেন্দ্রনাথের পৈত্রিক বাসভবন ছিল পঞ্চাননতলা রোড এবং মুক্তারাম দে লেনের সংযোগস্থলে। পিতা ৺সাতকড়ি ঘোষ ছিলেন মিলিটারী অর্ডন্যান্স বিভাগের কর্মচারী। মাতুলালয় হরিপালের কাছে রায়পাড়া গ্রামে হরেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৯১ সালের ১২ই নভেম্বর।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার ঠিক আগেই ১৯০৯ সালে হরেন্দ্রনাথকে পারিবারিক প্রয়োজনে অর্থ উপার্জনে নামতে হয়। কিন্তু শিক্ষার প্রতি ছিল তাঁর অদম্য আকাঙ্ক্ষা। তাই গোপনে এক ইংরাজ জাহাজ ব্যবসায়ীর সাহায্যে সামান্য খালাসীর কাজ নিয়ে সমুদ্রে ভেসে পড়লেন। নামলেন লণ্ডন নগরীতে, আর জাহাজে ফিরলেন না।

তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। হরেন্দ্রনাথ ইণ্ডিয়ান ভলাণ্টারী এ্যাম্বুলেন্স কোরে যোগ দিয়ে আহতদের শুশ্রূষায় পটু হয়ে উঠলেন। তাই ডাক পড়লো ফ্রান্স এবং মিশরের মিলিটারী হাসপাতালে। কার্য শেষে ফিরে এলেন লণ্ডন শহরে। ইন্সট্রাক-শনাল ফ্যাক্টরীতে প্রাথমিক শিক্ষার পর যোগ দিলেন কিংস কলেজে। শিক্ষান্তে যোগ দিলেন ওয়ার মিউনিশন ভলাণ্টিয়ার বাহিনীতে। ১৯১৮ সালে পিকাডেলী রয়েল এ্যারোনটিক্যাল সোসাইটির কাউন্সিল সদস্য হন। আরও কিছু শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা লাভের সময়ই প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে

সংযোগের ফলে ভবিষ্যৎ জীবনের পথ ঠিক করে ফেলেন। ১৯১২ সালে দেশে ফেরার পরই টাটা কোম্পানীতে চাকুরীর সুযোগ পান। কিন্তু দেশসেবার মতলব একবার মাথায় ঢুকলে আত্মচিন্তা আর থাকে না।।

১৯১৩ সালেই হরেন্দ্রনাথ হাওড়া শহরের যুবকদের সংগঠিত করার কাজে হাত দিলেন। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে একটির পর একটি করে যুব সংগঠন গড়ে তুলছেন। ব্যায়ামচর্চা এবং পাঠাগারের মাধ্যমে হাওড়ার যুবশক্তি নূতন করে জেগে উঠলো। যেখানে ক্লাব সেখানেই হরেনদার উপস্থিতি। হাওড়া সেবা সঙ্ঘের তিনি ছিলেন প্রথম যুগের সম্পাদক। হাওড়া সঙ্ঘ বলতে সবাই হরেনদার ক্লাব বলেই জানতো। যুবসংগঠনের বলে বলীয়ান হয়ে হরেন্দ্রনাথ হাওড়া কংগ্রেসের হাল ধরলেন। শহর কেন্দ্রীক কংগ্রেস প্রসারিত হতে থাকলো থানা থেকে থানা এবং গ্রাম থেকে গ্রামে। সমগ্র হাওড়া জেলায় কংগ্রেস হয়ে উঠলো সত্যিকার গণপ্রতিষ্ঠান। হরেন্দ্রনাথ হাওড়া জেলাতেই নিয়মনিষ্ঠ, পরিশ্রমী এবং আদর্শবাদী তরুণদের নিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন।

১৯৩৮ সাল পর্যন্ত হরেন্দ্রনাথই ছিলেন হাওড়া জেলা কংগ্রেসের কর্ণধার। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস ছাড়লেন। হরেন্দ্রনাথও সুভাষ-চন্দ্রকেই অনুসরণ করলেন। ফরোয়ার্ড ব্লকের জন্মলগ্ন থেকেই হাওড়া জেলা পুরোভাগে স্থান দখল করেছিল। সারা জেলার কংগ্রেস কর্মীরাই রাতারাতি ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগ দিলেন। মাত্র গুটিকয় মানুষ কংগ্রেস থেকে গেলেন।

হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ আন্দোলনে অধিকাংশ স্বেচ্ছা-সেবক হরেনবাবুই পাঠাতেন হাওড়া থেকে। ১৯৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলনে হরেনবাবুই ছিলেন জেলার নেতা। পুলিশ গ্রেপ্তার করে ৪ বছর বন্দী করে রেখেছিল। জেল থেকে বেরিয়ে ১৯৪৭ সালে হরেনবাবু বঙ্গীয় প্রাদেশিক ফরোয়ার্ড ব্লকের সাধারণ

সম্পাদক হলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র "ফরোয়ার্ড ব্লক" প্রকাশ করেন।

১৯৫০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী এই সর্বত্যাগী, আত্মভোলা, মহান নেতা ইহলোক ত্যাগ করেন। জেলবাসী হাওড়া ময়দানে নেতার স্মৃতি চিরজাগরুক রাখার জন্য মর্মরমূর্তি স্থাপন করে শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান করেছে।

কার্তিক চন্দ্র দত্ত

শ্রদ্ধেয় নেতা হরেন্দ্রনাথের সুযোগ্য সহকারী ছিলেন কার্তিক বাবু। হাওড়া শহর এবং সন্নিহিত গ্রামাঞ্চলের প্রায় সব সঙ্ঘ সমিতির সঙ্গেই কার্তিকবাবুর ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তিনি ছিলেন তিন পুরুষের প্রিয় কার্তিকদা।

১৯০০ সালের কার্তিক পূজার দিন কার্তিক চন্দ্রের জন্ম। পিতা ৺কুঞ্জবিহারী দত্ত। হাওড়া জেলা স্কুলে পড়ার সময়ই খেলাধূলায় কার্তিক চন্দ্রের পারদর্শিতা প্রকাশ পায়। সালিখা এ, এস স্কুল থেকে এনট্রেন্স পাশ করে কলেজে ভর্তি হন কিন্তু লেখাপড়া আর বেশী দূর এগোবার আগেই স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। কার্তিকচন্দ্র প্রধানত ছিলেন যুব আন্দোলনের সংগঠক। হাওড়া ভলান্টিয়ার দলের নায়ক।

১৯৩০ সালে প্রথম কারাবরণ করেন। ১৯৩১ সালে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নির্বাচিত হয়ে পৌরসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ঐ বছরই স্বাধীনতা দিবসে (২৬শে জানুয়ারী) আবার গ্রেপ্তার বরণ করেন। হাওড়া ময়দানে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় পুলিশের লাঠিচার্জে তাঁর কপাল ফেটে গভীর ক্ষত হয়। এই ক্ষতচিহ্ন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর ললাটে রাজটিকার মত দেদীপ্যমান ছিল।

১৯৩২ সালে আবার ২৬শে জানুয়ারী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পরিচালনার সময় পুলিশ গ্রেপ্তার করলো। তৃতীয়বার কারাবরণ। জেলের মধ্যে নির্মমভাবে অত্যাচারের পর দমদম থেকে মেদিনীপুর জেলে বদলী করে।

স্বাধীনতার পর কার্তিক চন্দ্র কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের সদস্য না হয়েই সমাজসেবার কাজে নিযুক্ত থাকা অবস্থায় ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলকে পরাজিত করার জন্য ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ ব্লক স্থাপন করেন। পৌরসভার অধিকাংশ আসন দখল করে ইউ, পি, বি কার্তিকচন্দ্রকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করে। আজীবন তিনি পৌরসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন। কার্তিক চন্দ্রের তিরোধানে শোকমগ্ন হাওড়াব যুবসমাজ এক বিরাট শোক-যাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিল।

কংগ্রেস পরিচালকদের দলীয় চক্রের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত জেলার জাতীয়তাবাদী কর্মীদেব নিয়ে "কর্মীদল" গঠন করে জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করেন। সহকর্মী শ্রীপ্রফুল্ল দাশগুপ্ত ছিলেন কর্মীদলের সম্পাদক। তারই সক্রীয় সহযোগীতায় প্রফুল্লবাবু এবং অন্যান্য কর্মীরা আর, ডব্লু, এ, সি এ্যাম্বুলেন্স প্রতিষ্ঠানের হাওড়া শাখা স্থাপন করেন।

হাওড়া টি, বি, হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা কার্তিকচন্দ্রই নেতাজীর মর্মব মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নেতাজী কমিটি গঠন করেন।

গোষ্ঠবিহারী মুখোপাধ্যায়

গোষ্ঠবিহারী মুখোপাধ্যায় ১৮৯০ সালে ডোমজুড়ের অন্তর্গত উত্তর ঝাঁপড়দহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

কলিকাতা সিটি কলেজ পাঠ সমাপন করে গ্রামের ডিউক ইনষ্টিটিউশনে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। দার্শনিক মনোভাব সম্পন্ন

গোষ্ঠবাবু অধিকাংশ সময় পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। বহু প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন।

১৯২৪ সালে বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছিলেন সরকারী সমর্থক। কাজেই গোষ্ঠবাবুকে বিদায় নিতে হল।

৩২নং রাউণ্ড ট্যাঙ্ক লেন থেকে পুলিশ ১৯২৭ সালে গোষ্ঠবাবুকে গ্রেপ্তার করে এবং রাজবন্দী হিসাবে প্রথমে প্রেসিডেন্সী জেল এবং পরে বহরমপুর জেলে বন্দী করে রাখে। মুক্তির পর বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে এবং তারপর ডোমজুড়ে অন্তরীণ করে রাখে। অন্তরীণকাল শেষ হবার পর তিনি বর্দ্ধমানে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৯৬৮ সালে এই কর্মযোগী পরলোকগমণ করেন।

সুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

হাওড়া জেলা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় (১৯২১) উৎসাহী যুবক সুশীল কুমার কলেজ ত্যাগ করে কংগ্রেস কর্মী হলেন। কয়েক মাসের মধ্যে সহ সম্পাদকের দায়ীত্ব গ্রহণ করে জেলার বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন সংগঠন করতে হয়। ঐকান্তিকতার সহিত কংগ্রেসের সেবায় নিযুক্ত থেকে ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ছিলেন সহ সভাপতি এবং তারপর সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ১৯৫২ সাল পর্যন্ত।

দেশবন্ধুর বিশ্বাসভাজন কর্মী হিসাবে স্বরাজ্য দলের দায়ীত্বশীল কর্মী ছিলেন। ১৯২১, ১৯২৩, ১৯৩০, ১৯৩২, ১৯৪০ এবং ১৯৪২ সালে বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে তিনি ৭ বারে প্রায় ১০ বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহ সম্পাদক এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

শেষ জীবনে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে মতের মিল না হওয়ায় তিনি পশ্চিমবাংলায় স্বতন্ত্র পার্টির সংগঠনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন।

৺বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র সুশীল কুমার ১৮৯৮ সালে শিবপুরের ১৯নং হেম ব্যানার্জী লেন, ঠাকুর বাটিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং কর্মবহুল জীবন যাপনের পর ১৯৬৬ সালের ১৬ই নভেম্বর পরলোকগমণ করেন।

সতীশ চন্দ্র ঢ্যাং

ব্রিটিশ সরকারকে এই দেশ হইতে উচ্ছেদকল্পে ভারতবর্ষের বিপ্লবী শক্তি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। এই মহান ব্রত লইয়া ১৯১৩ সালে হাওড়া জেলার সালকিয়াতে যে গুপ্ত সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, ৺সতীশ চন্দ্র ঢ্যাং ছিলেন অন্যতম সক্রীয় কর্মী। সুরেন চ্যাটার্জী লেন, সালকিয়া নিবাসী ৺সুরেশ চন্দ্র ঢ্যাং মহাশয়ের পুত্র সতীশচন্দ্র ১৯০১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার রাজনৈতিক জীবনে বিপ্লবী বিজন ব্যানার্জ্জী, বীরেন ব্যানার্জ্জী, সন্তোষ গাঙ্গুলী, গৌরমোহন দাসের সহকর্মী ছিলেন। প্রথমে তিনি দক্ষিণেশ্বরে বোমা মামলায় ধৃত হন অতঃপর কিছুদিন পর, তাঁহাকে 'হাওড়া বোমা' মামলায় আসামী করা হয়। বিচারে ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড জেলে বন্দী থাকাকালীন পুলিশ তাঁহাকে বিভিন্নভাবে অত্যাচার করে। কারাবাসের সহকর্মী গৌরমোহন দাসও সঙ্গে ছিলেন। এই বিপ্লবী আজ আর বাঁচিয়া নাই। কিন্তু তাঁহার ত্যাগ ও দেশপ্রেম দেশবাসীর কাছে এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। বর্ত্তমানে ৺সতীশ চন্দ্র ঢ্যাংয়ের পরিবার অতীব দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়া কালাতিপাত করিতেছে।

ধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

দামাল ছেলে ৺ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ডোমজুড় থানার অধীন দক্ষিণ ঝাঁপড়দহ গ্রামের ৺সুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র থাকাকালীন ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯১৮ সালে ডোমজুড় বিপ্লবী সঙ্ঘের সংস্পর্শে আসেন, পরে চন্দননগরের প্রবর্তক আশ্রমে যোগদান করিয়া কিছু ট্রেনিং গ্রহণ করেন। প্রবর্তক আশ্রমের অর্থনৈতিক সঙ্কট সমাধান কল্পে "ডোমজুড় সঙ্ঘ ভাণ্ডার" গঠন করেন। তিনি বর্দ্ধমান জেলার বেগুট গ্রামে গৃহশিক্ষক হিসাবে আত্মগোপন করিয়া তথায় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চালাইয়াছিলেন। অতঃপর তথা হইতে আন্দুল গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯৩০ সালে ইংরেজ সরকার তাঁহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করেন। পরে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করা হয়। ১৯৩০ সালের শেষভাগে তাঁহাকে সরকার গ্রেপ্তার করে এবং বকসা ডিটেনশান ক্যাম্পে আটক রাখে। সেখান হইতে রাজসাহীতে তাঁহাকে নজরবন্দী অবস্থায় রাখা হইয়াছিল। জেলে থাকাকালীন রক্তচাপে ভুগিয়া তিনি প্রায় অকর্মণ্য হইয়া পড়েন। মুক্তি পাইবার পর ১নং আরপুলি লেনে দেশপ্রিয় জে. এম. সেনগুপ্তর নেতৃত্বে যে শ্রমিক সংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল। তিনি তাঁহার উৎসাহী কর্মী ছিলেন। ডোমজুড়ের বিপ্লবী কার্যধারার সহিত তিনি নিজেকে মনেপ্রাণে যুক্ত রাখিয়াছিলেন, কিন্তু শরীর দিন দিন ভেঙে পড়ে। ১৯৫৭ সালে তাঁহার হঠাৎ মৃত্যু হয়।

জ্ঞানভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৺জ্ঞানভূষণ বন্দোপাধ্যায় (৬৫) ৩৭, বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জী লেন হাওড়া নিবাসী ৺হরিসাধন বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র।

যৌবনের প্রারম্ভে ১৯২৮ সালে বিপ্লবী পুলিন রায়ের সান্নিধ্যে আসিয়া ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে যোগ দেন। অসহযোগ, সত্যাগ্রহ প্রভৃতি আন্দোলনে যুক্ত থাকার অভিযোগে তিনি ১৯৩০ সালে গ্রেপ্তার হন এবং নয়মাস কারাবাস করেন। ১৯৩১ সালে তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেসের যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সক্রীয় বিপ্লবী কর্মী ছিলেন। শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক মামলার ব্যাপারে ফেরার থাকিলে জ্ঞাণভূষণকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা সম্পর্কীত যাবতীয় তথ্য সরবরাহ না করায় পুলিশ তাঁহার উপর অকথ্য নির্য্যাতন করেন। জেলা কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত হইবার পর পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন। এই সময় হাওড়ার ডি. আই. বি. অফিসে তাঁহার উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়। ফলে তাঁহাব মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে ; এবং কারাভোগের সময় তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এই অবস্থায় তাঁহাকে হাতে-পায়ে বেড়ী দিয়া মেদিনীপুর জেলে সেলের মধ্যে রাখা হয়। ইংরেজ সরকার কোনরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন নি। ১৯৬৭ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন।

হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

৺হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (৪৮) আমতা থানার, খালনা গ্রামের ৺সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। ১৯৩০ সালে বাগনান থানার অধীনে মদ, গাঁজা আফিঙ-এর দোকানে পিকেটিং করিবার ফলে অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। বন্দী অবস্থায় তিনি দমদম ও বহরমপুর জেলে ছিলেন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি শ্রীচণ্ডীদাস ঘোষ প্রমুখ সংগ্রামীদের সংস্পর্শে আসেন। দীর্ঘ রোগ ভোগের পর তিনি ১৯৬২ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তারাপদ মজুমদার

শিবপুর ১১নং কাশীনাথ চ্যাটার্জী লেনের ৺শিবকালী মজুমদারের পুত্র ৺ তারাপদ মজুমদার ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে কংগ্রেস নেতা সুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহকর্মী ছিলেন। তিনি ১৯৩০ সাল এবং ১৯৩২ সালে দুইবার আইন অমান্য এবং অসহযোগ আন্দোলনে কারাবরণ করেন।

১৯৫৮ সালে ৪৯ বছর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন।

সুবল চন্দ্র চক্রবর্তী

৺সুবল চন্দ্র চক্রবর্তী পাঁচলা থানার গোল্ডলপাড়া গ্রামের ৺যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পুত্র। রামকৃষ্ণপুর ৪২।বি, কৈলাশ বসু লেনে থাকার সময় জেলা কংগ্রেসের সদর দপ্তরে কর্মী হিসাবে যোগ দেন এবং আইন অমানা আন্দোলনে গ্রেফতার হয়ে ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন।

সুবল বাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী শ্রীযুক্তা যোগমায়া দেবী গ্রামের বাড়ীতেই বাস করছেন।

তরেন্দ্র নাথ ঘোষ

স্বাধীনতা সংগ্রামী ৺তরেন্দ্র নাথ ঘোষ মুগকল্যাণ গ্রামের ৺হরমাধব ঘোষ মহাশয়ের পুত্র।

১৯৩০ সালে গ্রামের স্বেচ্ছাসেবক শিবির থেকে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন। পুলিশের লাঠির আঘাতে হাত ভেঙ্গে যায়। ক্যাম্পের নেতা চণ্ডীদাস ঘোষের নির্দেশে তরুণ কর্মী তরেন্দ্র নাথ পুলিশের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরির কাজ সাফল্যের সঙ্গে করতেন। ৬ মাস জেল খেটে বাইরে এসে আবার স্বাধীনতা আন্দোলনেই যোগ দেন।

গ্রামের শীতলা মন্দিরে ছাগবলি বন্ধ করার জন্য তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন করে সফল হন এবং সমাজ সংস্কারের মহৎ কর্তব্য সম্পাদন করেন।

অমূল্য চরণ রায়

জুজারসাহা গ্রামের ৺বসন্ত রায়ের পুত্র অমূল্য চরণ বেঁচে থাকলে আজ তাঁর বয়স হত ৬৫ বছর।

১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ফেব্রুয়ারী মাসে গ্রেফতার হলেন। ৬ মাস কারাবাস করে ফিরে এলেন স্বগ্রামে। পরবর্তীকালেও স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথী ছিলেন।

সন্তোষ কুমার মাইতি

শ্যামপুর থানার নাওদা গ্রামের ৺হরিচরণ মাইতির পুত্র সন্তোষ কুমার যুবাবয়সে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। জেলার বিভিন্ন ক্যাম্পের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার কাজে তিনি পদব্রজে জেলার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে চলাফেরা করতেন।

বড়গেছিয়া শিবির থেকে আইন অমান্য করতে গিয়ে ১৯৩০ সালে ধরা পড়ে ৭ মাস কারাবাস করেন।

মদন মোহন পাত্র

পাঁচলা থানার জুজারসাহা গ্রামের ৺নগেন্দ্র নাথ পাত্রর পুত্র মদন মোহন অল্প বয়সেই কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক হন। ১৯৩২ সালে আইন অমান্য করে গ্রেপ্তারবরণ করেন এবং ছয় মাস কারাবরণ করেন।

অম্বিকা চরণ রায়

ছাত্র অম্বিকাচরণ স্বদেশী দলে নাম লিখিয়েছে। বাড়ীর লোকের আপত্তি। কিন্তু কে শোনে সে কথা। পালিয়ে চলে গেলেন মেদিনীপুর জেলার সুতাহাটা শ্রীকুমার চন্দ্র জানার স্বেচ্ছাসেবক শিবিরে। তমলুকে মদের দোকানে পিকেটিং করতে গেলেন ১৯৩২ সালে। মারধোর করে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। বিচারে ৬ মাস জেল। মুক্তির পর গ্রামে ফিরে এলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কংগ্রেস সমর্থক ছিলেন। মৃত্যুর অল্পদিন পূর্বেও যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীরা বাড়ী আক্রমণ করে অম্বিকাচরণকে মারধর করেছিল। তারই ফলে অল্প কয়েকদিন অসুস্থ তার পরই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

গিরিজা ভূষণ পাল

মাত্র ২২ বছর বয়সে একটি সম্ভাবনাময় জীবনের প্রদীপ নিভে গেল। বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র গিরিজা ভূষণ মুগকল্যাণের ৺নলিনীকান্ত পালের পুত্র। ১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহ করতে গিয়ে ছয় মাস কারাবাস করে এলেন। এবার আরও উদ্যম নিয়ে আন্দোলনে যোগ দিলেন। ধরা পড়তে দেরী হল না। হিজলী জেলে পাঠালো ৭ মাসের মেয়াদ খাটতে। তখন সেখানে ছিলেন হেমন্ত কুমার বসু এবং বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। অত্যাচারী জেলার বেছে বেছে শক্ত জোয়ান ছেলেদের সায়েস্তা করছেন। গিরিজা ভূষণের কপালে জুটলো মাড়ভাত। প্রতিবাদ করায় ডাণ্ডাবেড়ী এবং অন্ধকার সেল। মাঝে মাঝে লাঠির

আঘাত। শরীর ভেঙ্গে গেল। অসুস্থ অবস্থায় মুক্তি পেয়ে বাড়ী ফিরে শয্যা গ্রহণ করলেন। কলকাতা থেকে বড ডাক্তার এসে চিকিৎসা করিয়েও কিছু করা গেল না। পিতা মাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান অকালে ঝরে গেল।

তারাদাস ভট্টাচার্য

শ্রমিক নেতা তারাদাস ছিলেন প্রকৃত বিপ্লবী। পরিবর্তনশীল বিশ্বে শ্রমিক কৃষক আন্দোলনের মাধ্যমেই সমাজতন্ত্র কায়েম করা যাবে এই বিশ্বাস নিয়ে কংগ্রেস কর্মীরূপেই তিনি বেলুড়কে কেন্দ্র করে অনেকগুলি শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তুলেছিলেন।

বিয়াল্লিশের আন্দোলনে আত্মগোপন করে তিনি সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। বোমা তৈরী করে বিভিন্ন স্থানে কর্মীদের ব্যবহারের জন্য তিনি পাঠাতেন। গোয়েন্দা পুলিশ শেষ পর্যন্ত তাঁকে গ্রেপ্তার করলো ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর সেবায় যখন তিনি নিযুক্ত।

১৯৪৬ সালে মুক্তি পেয়েই ফিরে এলেন শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার জন্য। পুরাতন ইউনিয়নগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার সঙ্গে সঙ্গে আরও নূতন ইউনিয়ন গঠন করে অত্যাচারী মালিকগোষ্ঠীর বিরাগভাজন হলেন। তার চেয়েও দুঃখের কথা তদানীন্তন প্রদেশ কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ এই স্বাধীনচেতা সংগ্রামীকে ভাল চক্ষে দেখতে পারলেন না। একবার একটি কারখানার শ্রমিকদের দাবী পূরণের জন্য তিনি ১৫ দিন অনশন করেন। নেতা খান্দুভাই দেশাই এসে অনুরোধ করে অনশন ভঙ্গ করালেন। কিন্তু নিজেদের সরকারই তখন কলকারখানা মালিকদের অভিযোগের সত্যাসত্য বিচার না করে তারাদাসের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট

দাবী করে। নিজের দেশে যখন এই বিপরীত ব্যবহার চলছে তখন আহ্বান এল নেপাল কংগ্রেস থেকে। কৈরালা ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে নেপাল কংগ্রেস তখন রাজতন্ত্রের কবল থেকে নেপালকে স্বাধীন করার সংগ্রামে লিপ্ত। তারাদাস বোমা তৈরীর দায়িত্ব নিলেন। প্রচুর বোমা তিনি তৈরী করে ছিলেন। তারপর একটি বৃহৎ বোম তৈরী করার সময় প্রচণ্ড বিস্ফোরণে যে বাড়ীতে তিনি কাজ করছিলেন তা বিধ্বস্ত হয়ে যায়। তারা দাসের ছিন্ন ভিন্ন দেহাংশ সংগ্রহ করে নেপাল কংগ্রেস সামরিক মর্যাদায় শেষ-কৃত্য করেছিলেন।

একাধারে নিজের দেশ এবং অন্য একটি দেশের স্বাধীনতার জন্য তারাদাস সংগ্রাম করে অমর হয়ে গেলেন।